ছবি ও গল্প

"হাসি ও খেলা," "রাঙা ছবি" প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত
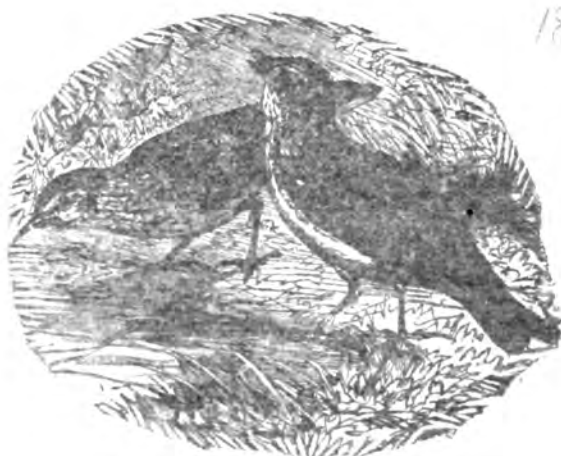
দ্বিতীয় সংস্করণ।

সিটী বুক সোসাইটী

৬৪নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য ৸৹ আনা।

কলিকাতা,

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে

ও

৬নং কলেজ-স্কোয়ার, সাম্য প্রেসে মুদ্রিত।

ভুমিকা

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে আমি "হাসি ও খেলা"র ভুমিকায়, অপেক্ষাকৃত বয়স্কবালকবালিকাদের গৃহপাঠ্য এবং পুরস্কার-প্রদানযোগ্য "ছবি ও গল্প" নামক এক খানি পুস্তক প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছিলাম। সম্প্রতি সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইল।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, তাঁহাদের রচিত কয়েকটী কবিতা ও গল্প এই পুস্তকে প্রকাশ করিতে অনুমতি দিয়া, আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। সেজন্য তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। ইহা ভিন্ন আরও কয়েকজন শ্রদ্ধেয় বন্ধুও এই পুস্তক প্রণয়ন সম্বন্ধে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন; আমি তাঁহাদের নিকটেও চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, যে উদ্দেশ্যে "ছবি ও গল্প" প্রকাশিত হইল, ইহাদ্বারা সেই উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণেও সিদ্ধ হইলে, আমি যারপরনাই আনন্দ লাভ করিব।

কলিকাতা,
১৩০৩।

গ্রন্থকার।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে "ছবি ও গল্পের" প্রথম সংস্করণের সমুদায় পুস্তক নিঃশেষিত হওয়াতে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণে কয়েকটী গল্প ও কবিতা পরিত্যক্ত এবং "কেনারাম" নামক একটী নূতন গল্প সন্নিবেশিত হইয়াছে। উক্ত গল্পের লেখক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়কে সেজন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

কলিকাতা,
১৩০৪।

গ্রন্থকার।

সূচী।

আবাহন।

কুসুমিত বন   করি বিচরণ
ভরিয়া কুসুম-ডালা,
হাসিমাখা ফুলে, সাধের মুকুলে
গাঁথিয়া এনেছি মালা।
আদরের ধন,   শিশির-শোভন
এ নব কুসুম-হার,
ধীরে কাছে এসে, সুমধুর হেসে,
লয়ে যাও উপহার!

ফাঁকি দিয়া স্বর্গ লাভ।

আমাদের গোবর্দ্ধন ওরফে গোবরা, নিতান্ত দুঃখে পড়িয়াই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল। এক দিন সে ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়া কেবল একটী মাত্র পয়সা পাইল; সেইটী লইয়া সে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেছে, এমন সময় ভিক্ষুকের বেশধারী এক দেবদূতের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। দূত তাহাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন—"ভাই সেই সকাল থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এখনও ত চার্‌টী অন্ন জুট্‌ল না। তোর কাছে যদি কিছু থাকে দে না, দাদা।"

"আরে ভাই, আমারও প্রায় সেই দশা! এই একটা পয়সা পেয়েছি, তা তোর যদি নেহাত অভাব থাকে, এই পয়সাটাই নে।" এই বলিয়া গোবরা দূতকে পয়সাটা দিতে গেল।

ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিতে দেখিয়া দূত বলিলেন, "ভাই, তোর প্রাণটা ত বেশ সরল! সরল লোককে আমি বড় ভাল বাসি। চল্‌, আমরা দুজনে দিন কয়েক ঘুরে ফিরে আসি।"

গোবরা। সেই ভাল, চল্‌, বিদেশে গেলে ভিক্ষেও মিল্‌বে ভাল।

দূত। তা ছাড়া আমি একটা বিদ্যে জানি, তাতেও আমাদের দরকার মত কিছু পাওয়া যাবে। আমি খুব কঠিন রোগ সারাতে পারি।

গোবরা। তবে ত মজাই হয়েছে, চল্‌।

এইরূপ কথা বার্ত্তা বলিয়া তাহারা দুই জনে দেশ ভ্রমণে বাহির হইল। ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারা এক স্থানে আসিয়া শুনিল, সেই দেশে এক কৃষকের ভয়ানক অসুখ হইয়াছে। এই শুনিয়া, তাহারা কৃষকের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। দেবদূত কৃষকের স্ত্রীকে কাঁদিতে দেখিয়া বলিলেন, "তোমার কোন ভয় নেই, আমি অসুখ সারিয়ে দিচ্ছি।" এই বলিয়া তিনি ঝুলির ভিতর হইতে একটা ঔষধ বাহির করিয়া কৃষককে খাওয়াইয়া দিলেন। সেই ঔষধের এমনি গুণ, যে খাইবামাত্র কৃষক উঠিয়া বসিল এবং সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিল।

যমের দুয়ার হইতে স্বামীকে ফিরিয়া পাইয়া কৃষকের স্ত্রীর আনন্দ আর ধরে না। আনন্দের বেগ কতকটা প্রশমিত হইলে, তাহারা স্বামী স্ত্রীতে করজোড়ে দূতের কাছে আসিয়া বলিল,

"বাবা! তোমার দয়াতেই আজ গরীব বেঁচে গেল! তুমি আজ যে উপকার করলে তা আমরা জন্মেও ভুল্‌ব না। কিন্তু বাবা, আমরা বড় গরীব! আমাদের আর কিছু নেই; এই ছাগলছানাটা নিয়ে আজ আমাদের দু'জনকে মাপ কর।"

তাহাদের কথা শুনিয়া দূত বলিলেন, "না না, আমি ত পুরস্কারের লোভে তোমাদের কাছে আসিনি! আমি কিছুই চাই না। ও ছাগলছানা তোমাদেরি থাক্‌।"

কিন্তু কৃষকেরা স্ত্রী পুরুষে কিছুতেই ছাড়িল না। বলিল, "বাবা! গরীব ব'লে আমাদের উপর নিদয় হ'ও না। ছাগল্‌টা নিতেই হবে।"

এত কাকুতি মিনতিতেও দূত ছাগলছানা নিতে অস্বীকার করিতেছেন, দেখিয়া, গোবরার আর সহ্য হইল না। বিশেষতঃ সেই নধর পাঁঠাটীর উপর তাহার বড় লোভ পড়িয়াছিল। সে দূতকে গোপনে ডাকিয়া বলিল, "তুমি এত বোকা কেন? ক্ষিদের জ্বালায় নাড়ী শুদ্ধ হজম হবার জোগাড় হচ্চে! এ সময় ভাগ্যগুণে যদি বা কিছু জুটলো, তাও তুমি নিতে চাচ্ছ না। এমন ক'রে হাতের লক্ষ্মী পায় ঠেল্‌লে কখনও ভাল হবে না" এই বলিয়া কৃষক দম্পতির সহিত সেও পাঁঠাটী লইবার জন্য দূতকে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল।

শেষে কিছুতেই তাহাদের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, দেবদূত ছাগলছানাটী গোবরার স্কন্ধে চাপাইয়া সে স্থান হইতে বাহির হইলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে ঠিক্‌ দুপুর বেলা তাঁহারা একটা জঙ্গলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে আসিয়া দূত গোবরাকে বলিলেন, "তুমি এখানে ছাগল্‌টা কেটে রান্না কর, আমি স্নান ক'রে আসি। আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত যেন খেতে ব'স না।" এই বলিয়া দূত স্নান করিতে গেলেন।

এ দিকে গোবরা পাঁঠাটী রাঁধিয়া বসিয়া আছে, দূত আর আসেন না। মাংসের সুগন্ধে চারিদিক ভরিয়া গেল! গোবরার মুখ দিয়া টস্‌ টস্‌ করিয়া লাল ঝরিতে লাগিল। তবুও দূতের সহিত দেখা সাক্ষাৎ নাই। শেষে আর লোভ সাম্‌লাইতে না পারিয়া, সে পাঁঠার হৃৎপিণ্ডটা বাছিয়া খাইয়া ফেলিল! খাইয়া সে সবে মুখ মুছিতেছে, এমন সময় দূত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দূত পূর্ব্বেই গোবরার কাণ্ড জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি অসুখের ভাণ করিয়া বলিলেন, "দেখ, আমার বড় অসুখ হয়েছে, আমি এ মাংস খাব না, এ সব তুমি খাও, আমাকে কেবল হৃৎপিণ্ডটা দাও।"

"আচ্ছা তাই বেশ, তুমি হৃৎপিণ্ডটাই খাও। এখনই আমি সেটা তোমায় দিচ্ছি!" এই বলিয়া গোবরা খুব ব্যস্ততার ভাব দেখাইয়া, হৃৎপিণ্ড খুঁজিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সেটা কোথায় ছিল, পাঠক পাঠিকার তাহা জানিতে বাকি নাই! অথচ সে কথাটা দূতকে বলিতেও তাহার সাহস হইল না। সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "দেখ ভাই, অনেক খুঁজ্‌লাম, কিন্তু কই হৃৎপিণ্ড ত পেলাম না! বোধ করি, পাঁঠার তাহা থাকে না।"

"সে কি, সব জন্তুর হৃৎপিণ্ড আছে, আর পাঁঠার নেই? তা কি কখনও হয়।"

"হবে না কেন? এই ত এতক্ষণ ধ'রে খুঁজ্‌লাম! থাক্‌লে কি আর পাওয়া যেত না?"

গোবরার কথায় দূতের বড় রাগ হইল। কিন্তু তিনি কোন রকমে রাগ চাপিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, না থাকে নাই থাক, এখানে আর দেরী করা হবে না। তুমি শীঘ্র মাংস খেয়ে নেও। নিয়ে চল, এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি।"

দেবদূত এই কথা বলিতে না বলিতেই, গোবর্দ্ধন টপাটপ্ সেই আস্ত ছাগলছানাটার সদ্গতি করিল! তাহার পর দূতের সঙ্গে বাহির হইল।

কিছু দূর গিয়া তাহারা সম্মুখে একটা নদী দেখিতে পাইল। নদী পার হওয়া ভিন্ন আর উপায় ছিল না। দেবদূতেরা যা ইচ্ছা করেন, তাই করিতে পারেন। তিনি দেখিতে দেখিতে হাঁটিয়া নদী পার হইয়া গেলেন। হাঁটু পর্য্যন্তও জল উঠিল না। কিন্তু গোবরচাঁদ যেই নামিয়াছে, অমনি তাহার কোমর অবধি জলে ডুবিয়া গেল, এবং ক্রমশঃই জল বাড়িতে লাগিল! সে দূতকে ডাকিয়া বলিল, "ভাই, তুমি ত বেশ মজার লোক, আমি ডুবে মরি, আর তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছ!" দূত বলিলেন, "পাঁঠার হৃৎপিণ্ডটা কোথায় গেল, যদি বল, তবে তোমাকে উঠাব, তা না হ'লে আমি চল্লাম।"

গোবরচাঁদ দেখিল, বড়ই মুস্কিল। মিথ্যা কথাটা স্বীকার করেই বা কি করে? বলিল, "আমি জান্‌লে কি আর আগে বল্‌তাম না!"

একেই গোবরার দেহের ভার তাহার উপরে আস্ত পাঁঠাটা তখনও পেটের মধ্যে গজ্ গজ্ করিতেছিল, তাহার ভারটাও বড় কম নয়! এই দুই ভারে গোবরা ক্রমশঃই ডুবিতে লাগিল। শেষে তাহার নাক অবধি জল উঠিল। সে মরে আর কি!

দূত বলিলেন, "এখনও দোষ স্বীকার কর, তা না হ'লে তোমার প্রাণ যাবে।" কিন্তু গোবরা কিছুতেই দোষ স্বীকার করিল না। যাহা হউক তাহাকে প্রাণে মারিতে দূতের ইচ্ছা ছিল না। তিনি তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহাকে উঠাইয়া ফেলিলেন।

তাহার পর আবার দুজনে চলিতে আরম্ভ করিল। কিছুদূর আসিয়া তাহারা শুনিল,

সেই দেশের রাজার মেয়ে কিছুক্ষণ হইল মরিয়া গিয়াছে। শুনিয়া, দূত বলিলেন, "আমি মরা লোককেও বাঁচাতে পারি। চল রাজার বাড়ী যাই।"

রাজার বাড়ী উপস্থিত হইয়া দূত বলিলেন, "আমি এই মেয়েকে বাঁচিয়ে দিতে পারি। আমাকে একখানি কড়া, এক কলসী জল, কিছু কাঠ ও একটু আগুন আনিয়া দাও।"

রাজার আদেশক্রমে সমুদায় দ্রব্য আসিল। দেবদূত সেই জিনিসগুলি এবং মরা মেয়েটা ও গোবরাকে লইয়া একটা ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাহার পর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া, তিনি আগুনে এক কড়া জল চাপাইয়া, মেয়েটার মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া সেই জলে সিদ্ধ করিতে দিলেন। অনেকক্ষণ সিদ্ধ হইয়া যখন হাড় হইতে সমুদায় মাংস খসিয়া পড়িল, তখন দূত সেই হাড়গুলি লইয়া, এক স্থানে সাজাইয়া, কি এক মন্ত্র পাঠ করিলেন। অমনি দেখিতে দেখিতে হাড়ের উপর মাংস হইল। ক্রমে সমুদায় অঙ্গ চর্ম্মে আচ্ছাদিত হইল, তাহার পর মেয়েটী উঠিয়া বসিল। তখন দূত দরজা খুলিয়া দিলেন। রাজা মরা মেয়েকে বাঁচিয়া উঠিতে দেখিয়া, আনন্দে একবারে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন এবং দেব-দূতকে তাঁহার এই উপকারের প্রতিদানস্বরূপ, অর্দ্ধেক রাজত্ব দিতে চাহিলেন। কিন্তু দেবদূত কিছুতেই টাকা কড়ি লইতে চাহিলেন না। দূতের ব্যবহারে গোবরার বড়ই রাগ হইল। সে কলে কৌশলে রাজার নিকট কিঞ্চিৎ অর্থ পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। রাজা আনন্দের সহিত গোবরার ঝুলী মোহরে ভরিয়া দিলেন।

রাজবাড়ী হইতে বাহির হইয়া কিছু দূর আসিয়া, দূত বলিলেন, "তুমি মোহর নিয়ে ভাল কাজ করনি! যা হ'ক, যখন নিয়েছ তখন এস দু'জনে ভাগ করে নিই।" এই বলিয়া দূত সেই মোহরগুলি তিনটা সমান ভাগে বিভক্ত করিলেন। তিনটা ভাগ করিবার উদ্দেশ্য কি, গোবরা কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে আগ্রহের সহিত দূতকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমরা ত দু'জন, তবে তিন ভাগ কর্‌লে কেন?"

দূত বলিলেন, "এক ভাগ তোমার, এক ভাগ আমার, আর এক ভাগ যে পাঁঠার হৃৎপিণ্ড খেয়েছে, তার।"

দূতের মুখের কথা শেষ হইতে না হইতেই গোবরা বলিয়া উঠিল, "সে আমি—আমিই সেটা খেয়েছি! ও ভাগটাও তবে আমার।"

"সে কি! পাঁঠার যে হৃৎপিণ্ড থাকে না, তবে তুমি কি করে খেলে?"

"আরে দূর! এও কি একটা কথা! সব প্রাণীর হৃৎপিণ্ড আছে, আর পাঁঠার নেই! আমি তখন মিছে কথা বলেছি!"

"তুমি মিছে কথা বলেছ? তবে আমি আর তোমার সঙ্গে থাক্‌তে চাই না। আমি মিথ্যাবাদী লোককে বড় ঘৃণা করি। তুমি বাকী মোহর গুলাও লও, আমি চল্লাম।"

গোবরের হাতে তখন অনেক টাকা, সে ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে লাগিল। বলিল, "তা এখন যেতে পার, এ টাকায় আমার জীবনভোর চল্‌বে।"

দেবদূত বলিলেন, "তুমি নিতান্ত মূর্খ, এ টাকা ক'দিন! দু'চার বৎসরের মধ্যে আবার তোমাকে ভিক্ষার ঝুলী নিতে হ'বে। যাহা হউক, এতদিন এক সঙ্গে রইলাম, তোমাকে একটা কিছু দিয়ে যাওয়া উচিত। তুমি এই ঝুলীটা নেও! তোমার যখন যা পেতে ইচ্ছে হবে তার নাম ক'রে, 'আমার ঝুলীর মধ্যে আয়,' এই কথা বল্‌বামাত্র, সেই জিনিস তখনই তোমার ঝুলীর ভিতর আস্‌বে!" এই বলিয়া দূত তাহাকে ঝুলীটা দিয়া, অন্য পথে চলিয়া গেলেন।

সঙ্গীকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া, গোবরারও বিদেশ ভ্রমণের ইচ্ছা কমিয়া গেল। সে দেশে ফিরিয়া আসিয়া, মজা করিয়া ঘর বাড়ী তৈয়ার করাইল, এবং বুক ফুলাইয়া খুব ঘুড়িগাড়ী হাঁকাইতে লাগিল। বাবুয়ানার চোটে দু এক বৎসর পরে তাহার হাতে আর কিছুই রহিল না। শেষে দূতের কথাই সত্য হইল। গোবরাকে আবার ঝুলী কাঁধে করিয়া বাহির হইতে হইল। একদিন গোবরা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘুরিয়াও থাকিবার স্থান ঠিক করিতে না পরিয়া, সন্ধ্যার পরে একটা সরাইয়ে গিয়া উপস্থিত হইল এবং সেখানে রাত্রিটা থাকিতে চাহিল।

সরাইয়ের কর্ত্তা বলিল, "এখানে যায়গা হবে না। তুমি অন্য যায়গায় যাও।"

গোবরা। সম্মুখের ঐ বাড়ীটা কার? অত বড় বাড়ীতেও কি একজনের যায়গা হবেনা?

"আরে, ও বাড়ীতে কি কেউ থাক্‌তে পারে? ও বাড়ীটা ভূতের আড্ডা! এক রাত ওখানে থাক্‌লে আর বাঁচ্‌তে হবে না!"

"আমার অত ভূতের ভয় নেই। ওটা কি তোমাদের বাড়ী? তোমার যদি আপত্তি না থাকে, আমি ঐ বাড়ীতে গিয়ে থাকি।"

"কেন বাপু, প্রাণটা হারাবে, গরীবের ছেলে আস্তে আস্তে ঘরে ফিরে যাও।"

"আচ্ছা, প্রাণ যায় আমার যাবে, তোমার তাতে কি? তুমি চাবিটা দাও।"

"কিছুতেই শুন্‌লে না, তবে মর গে!" এই বলিয়া সরাইয়ের কর্ত্তা সেই বড় বাড়ীর চাবিটা গোবরার হাতে দিল।

গোবরা একটা আলো লইয়া সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া, বেশ ভাল একটী ঘর বাছিয়া তাহাতে শয়ন করিল। রাত প্রায় ১২টা বাজিয়াছে, এমন সময় সেই ঘরে ভয়ানক একটা

শব্দ হইল। সেই শব্দে জাগিয়া উঠিয়া গোবরা দেখিল, বিকট মূর্ত্তি নয়টা ভূত রক্তবর্ণ চক্ষু বাহির করিয়া, পরস্পরের হাত ধরিয়া নাচিতেছে, আর চীৎকার করিতে করিতে ক্রমেই গোবরার কাছে আসিতেছে।
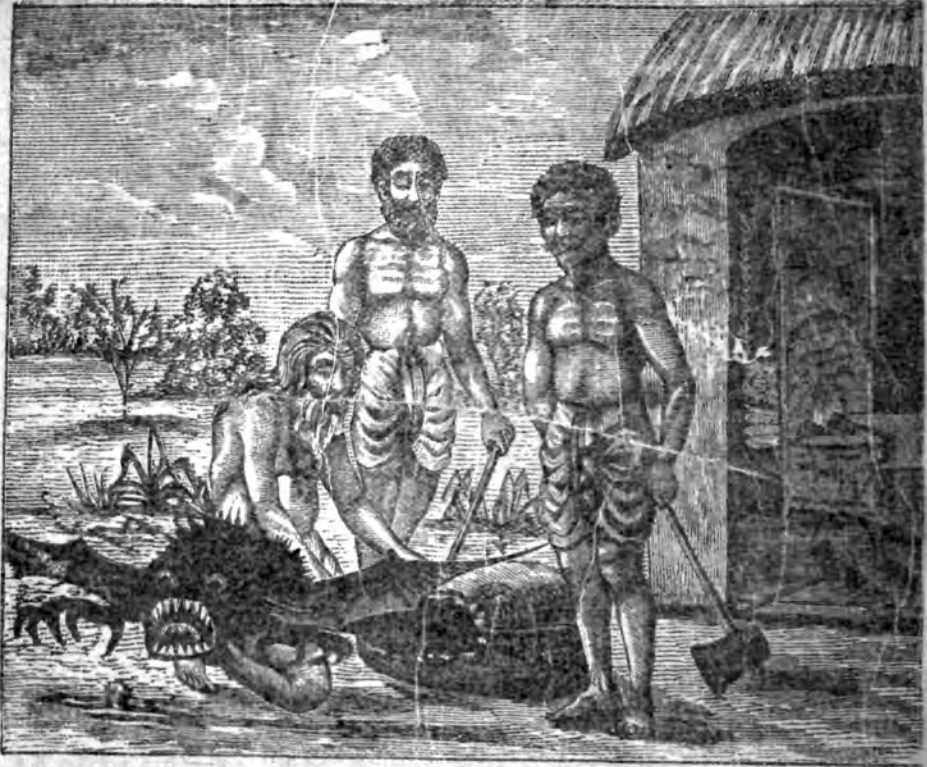
"ভূতটা বাহির হইয়া, একছুটে পলাইয়া গেল।" (১৪শ পৃষ্ঠা)

ভূতের কাণ্ড দেখিয়া গোবরার বড় রাগ হইল। সে চীৎকার করিয়া বলিল, "বড় আব্দার দেখ্‌ছি যে! রেতের বেলা ঘুম ভাঙ্গিয়ে নাচ দেখাতে এসেছে! আর বুঝি নাচ্‌বার যায়গা নেই! যদি ভাল চাস্‌, তোরা এখান থেকে চলে যা, তা না হ'লে ভাল হবে না বল্‌ছি!"

গোবরার তিরস্কারে ভয় পাওয়া দূরে থাক্‌, ভূত গুলা নাচিতে নাচিতে একেবারে গোবরার কাছে আসিয়া, তাহার গায়ের উপর লাফাইয়া উঠিল, এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গে আঁচড়

কামড় দিতে আরম্ভ করিল। গোবরাও কম লোক নহে, সে সুবিধা মত এক একটা ভূতের গলা টিপিয়া দেওয়ালের গায়ে আছাড় দিতে আরম্ভ করিল! কিন্তু সে একা, নয়টা ভূতের সহিত কতক্ষণ যুদ্ধ করিবে? যাহা হউক আরও কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিতে করিতে সেই দূত-প্রদত্ত ঝুলীর কথা গোবরার মনে পড়িল। মনে হইবামাত্র গোবরা বলিল, "তোরা নয়টা ভূত, আমার ঝুলীর মধ্যে যায়।" গোবরা যেই এই কথা বলিয়াছে, অমনি নয়টা ভূত একেবারে ঝুলীর মধ্যে ঢুকিল! গোবরাও সময় বুঝিয়া, ঝুলীর মুখ শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল এবং বাকী রাতটুকু নির্ভয়ে ঘুমাইল। পরদিন সকালে সরাইয়ের কর্ত্তা তাহাকে দেখিয়া বলিল, "একি, তুমি এখনও বেঁচে আছ?" গোবরা বলিল, "বেঁচে থাক্‌ব না কেন? এই দেখ না, সমস্ত ভূতগুলা আমার এই থলের মধ্যে পূরে বেঁধে ফেলেছি। এখন তোমরা নির্ভয়ে ঐ বাড়ীতে বাস কর গে, আর কোন ভয় নেই।"

সরাইয়ের কর্ত্তা গোবরার কার্য্য দেখিয়া, বিস্ময়ে অবাক্ হইল এবং আনন্দের সহিত তাহাকে অনেক পুরস্কার দিল। গোবরা সেই টাকা লইয়া একেবারে এক কামারের দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং দুইজন বলবান্ কামারকে টাকার লোভ দেখাইয়া বলিল, "তোমরা দু'জনে আমার এই থলেটার উপর খুব ভারী হাতুড়ী দিয়া ঘা দিতে থাক।" টাকার লোভে কামারেরা গোবরার ইচ্ছামত কাজ করিতে প্রস্তুত হইল। তাহারা যেই এক ঘা দিয়াছে, অমনি থলের মধ্যে, হাঁউ—মাঁউ—খাঁউ, মহা চীৎকার পড়িয়া গেল। কামারেরা সেই চীৎকারে ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া, কাঁপিতে লাগিল। গোবরা তাহাদিগকে সাহস দিয়া বলিল, "ভয় নেই, খুব জোরে ঘা দাও!" তাহারা সাহসে ভর করিয়া এক ঘণ্টা ধরিয়া, সেই থলের উপর আঘাত করিল। তখনও থলের ভিতর হইতে মাঝে মাঝে একটু একটু শব্দ বাহির হইতেছিল। শেষে আরও কয়েক ঘা দিবার পর শব্দ থামিয়া গেলে, গোবরা থলের বাঁধন খুলিতে আরম্ভ করিল। একটা ভূত—সে বড় বুদ্ধিমান্! চীৎকার করিলেই প্রাণ যাইবে, ইহা সে বুঝিয়াছিল। তাই সে চুপচাপ্ এক কোণে পড়িয়াছিল। গোবরা যেই থলে খুলিয়াছে, অমনি সেই ভূতটা বাহির হইয়া, এক ছুটে পলাইয়া গেল! বাকি আটটা ভূতের হাড় গোড় চূরমার হইয়া দফা শেষ হইয়া গিয়াছিল।

ইহার কিছুকাল পরে একজন সন্ন্যাসীর সহিত কথাবার্ত্তা হওয়াতে, গোবরার পরলোকে যাইবার ইচ্ছা বড়ই প্রবল হইয়া উঠিল। সেই সময়ে এক দিন সে একটা রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে, সম্মুখে দুটী রাস্তা দেখিতে পাইল। তাহার কোন্‌টাতে যাইবে, ঠিক করিতে না পারিয়া, সে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছে, এমন সময়, তাহার পরিচিত সেই সন্ন্যাসী আসিয়া

উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইয়া, গোবরা কোন্ রাস্তা কোথায় গিয়াছে, জানিতে চাহিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, "এই যে খুব বড় সোজা রাস্তাটী দেখিতেছ, এটী

নরকে গিয়াছে। এই রাস্তায় গেলে খুব শীঘ্র নরকে পৌছান যায়! আর ঐ যে ক্ষুদ্র একটী বাঁকা চোরা রাস্তা দেখিতেছ, ঐটী স্বর্গে গিয়াছে। ঐ রাস্তা ধরিয়া বহুকাল চলিলে, তবে স্বর্গে পৌছান যায়!"

সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া গোবরা ভাবিল, "আমি বুড়া মানুষ, অমন খারাপ রাস্তা দিয়া, আমি স্বর্গে নাই বা গেলাম, এই সোজা রাস্তা ধরিয়া আমি নরকেই যাই!" এই ভাবিয়া গোবরা নরকের পথে চলিল। খানিক দূর গিয়াই সে প্রকাণ্ড একটা ফটক্ দেখিতে পাইল। সেইটী নরকের ফটক্। গোবরা ফটকের কাছে উপস্থিত হইবামাত্র দেখিল, সেই যে ভূতটা তাহার থলের ভিতর হইতে পলাইয়া গিয়াছিল, সেইখানে সে পাহারা দিতেছে। ভূতটা গোবরাকে আসিতে দেখিয়া, ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে, নরকের ফটক্ বন্ধ করিয়া ফেলিল এবং একেবারে তাহাদের রাজার কাছে গিয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ, সর্ব্বনাশ, সেই গোবরা এসেছে! ওকে কিছুতেই এখানে ঢুক্‌তে দিও না। ওর কাছে একটা থলে আছে, একবার সেই থলেতে পূরে আমাদের আট জনকে ও মেরে ফেলেছিল। ও যদি নরকে ঢুক্‌তে পায়, তবে আমাদের সকলকে সেই থলেতে পূরে নিয়ে যাবে!" তাহার কথা শুনিয়া

ভূতেদের রাজার বড় ভয় হইল। সে বাছা বাছা পালোয়ান্ ১০টা ভূত ডাকিয়া বলিল, "সাবধান, গোবরা যেন এখানে ঢুক্‌তে না পায়! তোমরা দোর চেপে থাক গে!"

নরকের দরজা বন্ধ দেখিয়া, গোবরা অগত্যা ফিরিয়া আসিয়া আবার স্বর্গের রাস্তা ধরিয়া চলিল! ক্রমাগত কয়েক মাস চলিয়া, অবশেষে সে স্বর্গের ফটকের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়াই দেখিল, তাহার পূর্ব্বপরিচিত ভিক্ষুকের বেশধারী সেই দেবদূত সেখানে পাহারা দিতেছেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া গোবরা বলিল, "কি হে ভাই, তুমি এখানকার মালিক? তা বেশ! একবার দোরটা খুলে দাও ত, স্বর্গে প্রবেশ করি!"

দূত বলিলেন, "আরে ভাই ত! এত দিন তুমি কোথায় ছিলে? ভাল আছ ত? তা—এত কষ্ট ক'রে এখানে এসেছ বটে, কিন্তু ভাই, দোর খোল্‌বার ত হুকুম নেই! যারা যারা এখানে আস্‌বে, আমার কাছে তাদের নামের একটা ফর্দ্দ আছে। কই, তার মধ্যে তোমার নাম ত দেখ্‌ছি না?

"সে কি! তবে আমি যাই কোথা! নরকেও স্থান নেই, স্বর্গেরও দোর বন্ধ! আমার কি তবে কোথাও আশ্রয় নেই? তোমার এই থলেটাই ত যত নষ্টের গোড়া! এইটে দেখেই ত নরকের দরোয়ান আমায় ঢুক্‌তে দিলে না! তা তুমি যদি আমাকে স্বর্গে ঢুক্‌তে না দাও, তোমার থলেটা তবে ফিরিয়ে নেও। আমি আবার নরকে গিয়ে দেখি, কোন সুবিধে কর্‌তে পারি কি না!"

"তা বরং দাও। থলেটা নিতে আমার কোন আপত্তি নেই।" এই বলিয়া দূত হাত বাড়াইয়া, যেই থলেটা লইয়া ভিতরে রাখিয়াছেন, অমনি গোবরা বলিয়া উঠিল, "আমি ইচ্ছা করি যে, আমি এখনই থলের ভিতরে যাই!"

এই কথা বলিবামাত্র গোবরা স্বর্গের ভিতরে, সেই থলের মধ্যে উপস্থিত হইল! তাহার উপস্থিতবুদ্ধি দেখিয়া, দেবদূত চমৎকৃত হইলেন!

বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদী এল বাণ

দিনের আলো নিবে এল, সূর্য্যি ডোবে ডোবে ;
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে চাঁদের লোভে লোভে।
মেঘের উপর মেঘ করেছে, রঙের উপর রঙ।
মন্দিরেতে কাঁশর ঘণ্টা বাজ্‌ল ঠং ঠং।
ও পারেতে বিষ্টি এল ঝাপ্‌সা গাছ পালা।
এ পারেতে মেঘের মাথায় একশো মাণিক জ্বালা।
বাদ্‌লা হাওয়ায় মনে পড়ে ছেলেবেলার গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বাণ।"

আকাশ জুড়ে মেঘের খেলা কোথায় বা সীমানা !
দেশে দেশে খেলে বেড়ায় কেউ করে না মানা।
কত নূতন ফুলের বনে বিষ্টি দিয়ে যায় !
পলে পলে নূতন খেলা কোথায় ভেবে পায় !
মেঘের খেলা দেখে কত খেলা পড়ে মনে !
কত দিনের লুকোচুরী কত ঘরের কোণে !
তারি সঙ্গে মনে পড়ে, ছেলেবেলার গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদী এল বাণ।"

মনে পড়ে ঘরটি আলো মায়ের হাসিমুখ,
মনে পড়ে মেঘের ডাকে গুরু গুরু করে বুক।
বিছানাটির একটি পাশে ঘুমিয়ে আছে খোকা,
মায়ের পরে দৌরাত্মি, সে না যায় লেখা জোকা।
ঘরেতে দুরন্ত ছেলে করে দাপাদাপি,
বাইরেতে মেঘ ডেকে ওঠে সৃষ্টি ওঠে কাঁপি।
মনে পড়ে মায়ের মুখে শুনেছিলেম গান,
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদী এল বাণ।"

মনে পড়ে সুয়োরাণী দুয়োরাণীর কথা,
মনে পড়ে অভিমানী কঙ্কাবতীর ব্যথা,
মনে পড়ে ঘরের কোণে মিটিমিটি আলো,
চারিদিকে দেয়ালেতে ছায়া কালো কালো।
বাইরে কেবল জলের শব্দ ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্—
দস্যি ছেলে গল্প শোনে একেবারে চুপ্।
তারি সঙ্গে মনে পড়ে মেঘ্লা দিনের গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদী এল বাণ।"

কবে বিষ্টি পড়েছিল, বাণ এল সে কোথা !
শিবুঠাকুরের বিয়ে হ'ল কবেকার সে কথা ;
সে দিনো কি এম্নিতর মেঘের ঘটা খানা ?
থেকে থেকে বিজুলী কি দিতেছিল হানা ?
তিন কন্যে বিয়ে ক'রে কি হ'ল তার শেষে !
না জানি কোন্ নদীর ধারে, না জানি কোন্ দেশে,
কোন্ ছেলের ঘুম পাড়াতে কে গাহিল গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর্ নদী এল বাণ।"

সাপের গল্প

গোখুরা ও র‍্যাটেল সাপ

পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই কোন না কোন জাতীয় বিষধর সাপ দেখিতে পাওয়া যায়। সকল প্রকার বিষধরের বিষই উপরের চোয়ালের দুই পার্শ্বে বড় বড় দুটী তীক্ষ্ণ দাঁতের গোড়ায় থলিয়ার মধ্যে থাকে। দাঁতের ভিতর দিয়া এপার ওপার সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্র থলিয়ার সহিত সংযুক্ত। সাপ যখনই ক্রুদ্ধ হইয়া দংশন করে, তখনই থলিয়ার ভিতর হইতে অল্প পরিমাণ বিষ, দন্তের ছিদ্রের ভিতর দিয়া, ক্ষতস্থানে গিয়া প্রবেশ করে। এই বিষ রক্তের সহিত মিশিলেই সর্ব্বনাশ!
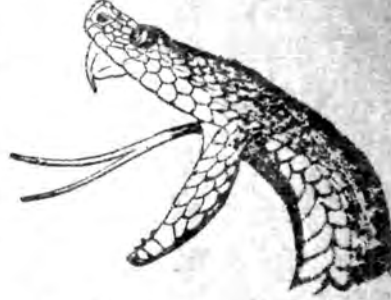
যত প্রকার বিষধর সাপের কথা শুনা গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে আমাদের দেশের 'গোখুরা' ও আমেরিকা দেশের 'র‍্যাটেল' সাপ বড় ভয়ঙ্কর। ইহাদের ভয়ে ভীত হয় না, এরূপ প্রাণী প্রায় নাই। সামান্য বেঙ, ইঁদুর হইতে মহিষ, বাঘ প্রভৃতি বড় বড় জন্তু, সকলেই একটী সামান্য বিষধরকে দেখিলে ভয়ে অস্থির হইয়া পড়ে, এবং প্রাণভয়ে পলাইতে চেষ্টা করে। গোখুরা প্রভৃতি সাপ ক্রূর-প্রকৃতি সত্য, কিন্তু ইহারাও সময় সময় পোষ মানিয়া থাকে। একবার লঙ্কাদ্বীপের এক ধনীব্যক্তি তাঁহার বাড়ী পাহারা দিবার জন্য কয়েকটা গোখুরা সাপ পুষিয়াছিলেন। তাহাদের ভয়ে চোর ডাকাত কেহ সেই বাড়ীতে আসিতে সাহস করিত না। সাপগুলা কিন্তু বাড়ীর কাহাকেও কিছুই বলিত না।

পর পৃষ্ঠায় একটী র‍্যাটেল সাপের চিত্র দেওয়া হইল। আমেরিকার নানা স্থানে এই সাপ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের লেজের শেষ দিকটা চর্ম্মে আবৃত নহে; কেবল

কয়েকখানি হাড় সাজান থাকে মাত্র। যখন এই সাপ চলিতে থাকে, তখন ঐ সকল হাড় হইতে এক প্রকার খড়্ খড়্ শব্দ বাহির হয়। সেই শব্দ হইতেই ইহাদের র‍্যাটেল সাপ নাম হইয়াছে। আমাদের দেশের গোখুরা প্রভৃতির ন্যায় ইহারা
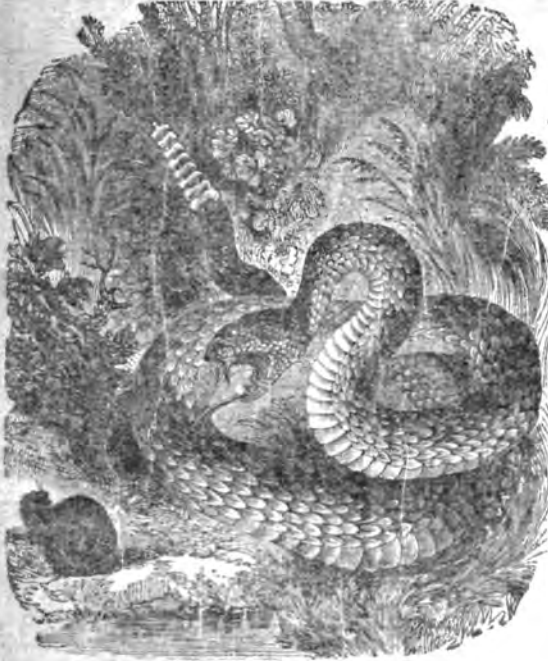
ফণা ধরিতে পারে না বটে, কিন্তু ইহাদের বিষেরও খুব তেজ। একবার একটা র‍্যাটেল সাপ একটী লোককে তাহার ছেঁড়া জুতার ভিতর দিয়া দংশন করে; তাহাতে তাহার মৃত্যু হয়। পরে অপর একটী লোক সেই জুতা পায় দেওয়াতে তাহারও মৃত্যু হয়। তৎপরে আরও একজন এইরূপে জীবন হারাইলে, বিশেষ অনুসন্ধানে জুতার ভিতর দিকে সাপের বিষদাঁতের ছোট একটী টুক্‌রা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাই পুনঃ পুনঃ পায়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়াতে ক্রমান্বয়ে তিন ব্যক্তি জীবন হারাইয়াছিল!

শুনিতে পাওয়া যায়, র‍্যাটেল প্রভৃতি কয়েক জাতীয় সাপ কখন কখন পরস্পরকে জড়াইয়া, স্তূপাকার ভাবে গর্ত্তের মধ্যে অথবা রৌদ্রের উত্তাপে পড়িয়া থাকে। বিখ্যাত পর্য্যটক হামবোল্‌ড্ সাহেব তাঁহার একখানি পুস্তকে র‍্যাটেল সাপের একটী অতি প্রকাণ্ড স্তূপের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "গায়না প্রদেশের কোন এক জঙ্গলের ভিতর দিয়া এক দিন আমরা কয়েক জনে ঘোড়ায় চড়িয়া চলিয়াছি, এমন সময় সম্মুখের এক ব্যক্তি ফিরিয়া আসিয়া বলিল, মহাশয়, পিরামিডের মত প্রকাণ্ড সাপের স্তূপ দেখিতে চান ত আসুন! এই বলিয়া সে আমাদিগকে সেই স্তূপের দিকে লইয়া চলিল। আমরা একটু অগ্রসর হইয়াই একটী 'সর্প-পিরামিড' দেখিতে পাইলাম। সেই স্তূপে প্রায় হাজার বারশ' সাপ অবস্থিতি করিতেছিল; আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া সাপগুলি

অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল, এবং রক্তবর্ণ চক্ষে আমাদের দিকে চাহিয়া একপ্রকার ভয়ঙ্করশব্দ করিতে লাগিল। এই ভয়ানক স্তূপ দেখিয়া আমাদের মনে যে কি এক ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। ভয়ে এবং বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া, শীঘ্রই আমরা অন্যত্র চলিয়া গেলাম।

পাহাড়ে বোড়া।

এই জাতীয় সাপ খুব বড় বড় হয়। ইহাদের দেহের বলও অসাধারণ। ইহাদের নিকট পরাস্ত হয় না, এমন প্রাণী অতি অল্পই আছে। ইহারা আস্ত হরিণ পর্য্যন্ত গিলিতে

পারে। এমন কি, কখন কখন ইহারা বাঘকেও আক্রমণ করে। অন্য কোন রকমে আহার সংগ্রহ করিতে না পারিলে ইহারা নদী অথবা হ্রদের ধারে লুকাইয়া থাকে, এবং কোন প্রাণী জলপান করিতে আসিলেই অমনি তাহাকে ধরিয়া ফেলে।

একবার এক সাহেব একটা কুকুর লইয়া, গভীর জঙ্গলের ভিতর শিকার করিতে গিয়া

ছিলেন। কুকুরটী এদিক সেদিক ছুটাছুটি করিতে, করিতে হঠাৎ একটা ঝোপের ভিতর হইতে ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে লাগিল। সাহেব অনেক ডাকাডাকি করিলেও সে তাঁহার কাছে আসিল না, বরং অধিকতর কাতরভাবে চীৎকার করিতে লাগিল। ব্যাপারটা কি দেখিবার জন্য, সাহেব ঝোপের দিকে একটু অগ্রসর হইয়াই দেখিতে পাইলেন, প্রকাণ্ড একটা পাহাড়ে সাপ কুকুরটাকে জড়াইতেছে। এই দেখিয়াই সাহেব বন্দুক ঠিক করিয়া সাপের মাথায় গুলি মারিলেন। আঘাত পাইয়া সাপ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং কুকুরকে ছাড়িয়া সাহেবকে তাড়া করিল; সাহেবও ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। কিন্তু সাপের সহিত অাঁটিয়া উঠা সহজ নয়। বেগতিক দেখিয়া সাহেব মস্ত একটা গাছে উঠিয়া পড়িলেন। দেখিতে দেখিতে সাপটাও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং শিকারের লোভে সেই গাছে উঠিতে লাগিল। তখন সাহেব তাহার মাথা লক্ষ্য করিয়া আরও দুইটী গুলি মারিলেন। তাহাতে তাহার চক্ষু দুইটী নষ্ট হইল বটে, কিন্তু প্রাণ নষ্ট হইল না। সাপ সেই অবস্থাতে গাছে চড়িতে লাগিল, কিন্তু চক্ষুহীন হওয়াতে ঠিক সাহেবের দিকে যাইতে পারিল না। সুযোগ বুঝিয়া সাহেব তখন আরও কয়েকটী গুলি ছুড়িয়া, সাপটাকে মারিয়া ফেলিলেন। সাহেবের অদৃষ্টগুণে অগ্রেই সাপের চক্ষু-দুটী নষ্ট হইয়াছিল, তাই রক্ষা। তাহা না হইলে সাহেবের যে কি দশা হইত, তাহা বলা যায় না।

প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বলেন, "সাপের দৃষ্টিতে এমন একটা শক্তি আছে, যাহার বলে সে যে কোন প্রাণীর দিকে চায়, তাহাকেই যাদু করিয়া ফেলে। একবার একটা সাপ

এক সময়ে ছয়টী পাখীকে তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির দ্বারা অভিভূত করে। পাখীগুলি অবশ্য খুব কাছাকাছি বসিয়াছিল। সাপের মোহে পড়িয়া পাখীগুলি ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই পলাইতে পারিল না। ইহাতে সাপের আনন্দ দেখে কে? সে মজা করিয়া ক্রমে ক্রমে সেই ছয়টী পাখীকেই খাইয়া ফেলিল। পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় যে ছবিখানি রহিয়াছে, তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, একটা হরিণ প্রকাণ্ড এক সাপের দৃষ্টিতে পড়িয়া, ভয়ে কিরূপ আড়ষ্ট হইয়া রহিয়াছে!

সামুদ্রিক সর্প।

বহু কাল হইতে পৃথিবীর নানা স্থানের লোকের মনে সামুদ্রিক মহাসর্পের অস্তিত্বে বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। রোমের বিখ্যাত ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিত লিভি লিখিয়াছেন, "রোমক সৈন্যগণ কার্থেজ আক্রমণ করিতে যাইবার সময় আফ্রিকার এক নদীর তীরে প্রকাণ্ড এক সাপ দেখিতে পায়। তাহারা অনেক কষ্টে সাপটাকে হত্যা করে। রোম নগরে সেই সাপের চর্ম্ম আনা হয়; তাহা দীর্ঘে ৮০ হাত।"

কোন মার্কিন গ্রন্থকার তাঁহার একখানি পুস্তকে কতকগুলি ভীষণ সামুদ্রিক সর্পের উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে একখানি জাহাজ পেনোবস্কট্‌ সাগর দিয়া যাইতেছিল। সেই জাহাজের নাবিকগণ সহসা দেখিতে পাইল, কিছুদূরে একটা ভীষণ প্রাণী সাগর জলে বিশাল দেহ ভাসাইয়া সাঁতার দিতেছে। তাহার দেহের বর্ণ গাঢ় নীল, এবং পৃষ্ঠদেশে অসংখ্য ক্ষুদ্র সারিগাঁথা কতকগুলি পিপার ন্যায় ভাসিতেছিল। নাবিকেরা প্রথমে তাহাকে সাপ বলিয়া বুঝিতে পারে নাই। কিছু ক্ষণ পরে যখন তাহারা সেই প্রকাণ্ড জন্তুটীকে জল হইতে প্রায় ২০ হস্ত পরিমাণ দেহাংশ উচ্চে তুলিয়া, তাহাদের খুব নিকট দিয়া যাইতে দেখিল, তখন আর তাহাকে সাপ বলিয়া বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না; সেই ভীষণ সাপকে দেখিয়া, তাহারা স্তম্ভিত হইয়া গেল। মহাসর্পটী দীর্ঘে ৮০ হস্তেরও অধিক ছিল।

অপর কোন গ্রন্থকার একটী সাপের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন; সেই সাপ দীর্ঘে প্রায় ১৩৩ হাত এবং তাহার শরীরের বেড় প্রায় ১৪হাত। সাপটা না কি ভেড়া, বাছুর, শূকর প্রভৃতি অক্লেশে গিলিয়া ফেলিত! কখন কখন মাস্তুলের মত ঘাড় উচ্চে তুলিয়া সেই সাপ জাহাজের ডেকের উপর হইতে মানুষ ধরিয়াও আহার করিত!

পণ্টোপিডান নামে কোন বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌ তাঁহার "নরওয়ে দেশের প্রাকৃতিক ইতিহাস" নামক পুস্তকে একটী চারি শত হস্ত দীর্ঘ সামুদ্রিক মহানাগের উল্লেখ করিয়াছেন;

সেই ভয়ঙ্কর সর্প ১৮১৯, ১৮২২, এবং ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে নরওয়ের উপকূল হইতে কিঞ্চিৎ দূরে দেখা গিয়াছিল। অপর কোন প্রাণিতত্ত্ববিদ্ বলেন, তাহাকে ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে গ্রিণলণ্ডের

নিকটস্থ সমুদ্রতীরে দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮১৫, ১৮১৭, ১৮১৯, ১৮৩৩ এবং ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তাহাকে আমেরিকার অন্তর্গত বোষ্টন নগরের কাছে দেখা যায়। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার 'ডিডেলাস্' নামক জাহাজের নাবিকগণ তাহাকে দক্ষিণ আটলাণ্টিক মহাসাগরে দেখিয়াছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে 'পলিন' নামক অপর একখানি জাহাজের নাবিকগণও সেই মহাসর্পকে দেখিতে পায়। তাহার বেড় ছয় হাত।

উক্ত পলিন জাহাজের নাবিকগণ দক্ষিণ আটলাণ্টিক মহাসাগরে আর একটা প্রকাণ্ড সাপ দেখিতে পায়; সেই সাপ না কি খুব বড় একটা তিমির শরীরে দুই পাক জড়াইয়া তাহাকে জল হইতে কিছু উচ্চে তুলিয়া, পরক্ষণেই একেবারে ডুবাইয়া লইয়াছিল!

সামুদ্রিক মহাসর্পের বিষয়ে এই রূপ আরও অনেক অত্যাশ্চর্য্য গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের অনেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এই রূপ সাপের অস্তিত্বে সন্দেহ করেন। তাঁহারা বলেন, নাবিকগণ সামুদ্রিক অন্যান্য প্রাণী দেখিয়া ভ্রমবশতঃ অনেক সময় তাহাদিগকে সাপ ভাবিয়া থাকে। কিন্তু এ প্রকার সাপ থাকা একেবারেই যে অসম্ভব, এ কথা এখনও ভালরূপ প্রমাণিত হয় নাই।

পরাজয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

তখন আমার বার বৎসর বয়স। এক দিন মা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মোহনলাল, দেখ্‌তে দেখ্‌তে তুই বড় হয়ে পড়্‌লি; আর হেসে খেলে সময় নষ্ট কর্‌লে চল্‌বে না। কালই তোকে স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দেবো।"

এত বয়স পর্য্যন্ত স্কুলে ভর্ত্তি হই নাই শুনিয়া, কেহ কেহ হয় ত আশ্চর্য্য বোধ করিবেন। কিন্তু তাঁহারা যদি সকল দিক দেখিয়া শুনিয়া বিচার করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন যে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। প্রথম, আমি নেহাত গরিব লোকের ছেলে নই,—ঘরে অন্নের বিশেষ অভাব ছিল না, দ্বিতীয়, আমি মায়ের একমাত্র সন্তান,—আব্‌দারের সীমা ছিল না; তৃতীয়, নিতান্ত শিশু অবস্থায় আমি পিতৃহীন হই,—শাসন করিবার কেহই ছিল না। সুতরাং এরূপ সুযোগের মধ্যে পড়িলে, কোন্ বালকই বা বার বৎসরের পূর্ব্বে স্কুলে ভর্ত্তি হয়? আমি মায়ের আদুরে গোপাল হইয়া হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটাইতাম। মাকে বেলা দুপর পর্য্যন্ত ফাঁকি দিয়া, বাগানে বাগানে পাখীর ছানা খুঁজিয়া বেড়াইতাম; কখন সমবয়সীদের সঙ্গে জুটিয়া প্রতিবাসীর বাগানে পাকা কুল, বাতাপী লেবু, কাঁচা আম, কচি শশা প্রভৃতি চুরি করিতে যাইতাম। কখন বা জেলের ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া ঝড় বৃষ্টি মাথায় করিয়াও গাঙ্গে নৌকা চড়িয়া বেড়াইতাম; কখন গাঙ্গের চড়ায় গিয়া চড়িভাতি করিতাম। একদণ্ড আমাকে বাড়ীতে কেহ স্থির হইয়া থাকিতে দেখে নাই। দুপরবেলা মা আমাকে "বর্ণ পরিচয়" ও শ্লেট পেন্‌সিল দিয়া ঘরে বসাইয়া দিতেন, কিন্তু আমি তাঁহার চক্ষে ধূলা দিয়া, পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে গিয়া মিশিতাম এবং দাণ্ডা গুলি ও কপাটী খেলায় সারাদিন কাটাইয়া সন্ধ্যার সময় ঘরে ফিরিতাম।

আমি আরও কয়েক বৎসর হাসিয়া খেলিয়া কাটাইতে পারিতাম; কিন্তু পাড়ার কয়েকটী দুষ্ট ছেলের সহিত আমার অতিশয় ঘনিষ্ঠতা হওয়াতে, মা বড়ই ভীত হইলেন এবং স্কুলে যাইতে আরম্ভ করিলে, তাহাদের সঙ্গে আমার বেড়ান বন্ধ হইবে, এই ধারণায় তিনি পর দিনই আমাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। কিন্তু মায়ের বুঝিবার নিতান্তই ভুল হইয়াছিল।

স্কুলে গিয়া অতি অল্প দিনের মধ্যেই আমি অনেকগুলি কুসঙ্গী পাইলাম ; এবং তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া, স্কুল পলাইয়া, বাগানে বাগানে ঘুরিয়া—পাখীর ছানা ও ফল মূল চুরি করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

স্কুলেও আমার মন্দ স্বভাব প্রকাশ হইয়া পড়িল ; আমাদের ক্লাসে নেপাল ও মণিরাম নামে দুইটী ছেলে ছিল। নেপাল প্রায় আমার সমবয়স্ক, মণিরামের বয়স নিতান্ত অল্প। এই দুই জনের সঙ্গে আমার একেবারেই বনিত না—প্রায় ঝগড়া বিবাদ হইত। মণিরাম বয়সে ছোট বলিয়া অনেক সময়, এমন কি বিনা দোষেও, তাহাকে প্রহার করিতাম। কিন্তু মনে মনে খুব রাগ থাকিলেও নেপালের উপর কোন অত্যাচার করি, এমন সাহস আমার ছিল না।

ক্লাসের প্রায় সকলেই আমাকে ও নেপালকে ভয় করিত। তাহার কারণ, নেপালের ভালবাসা ও আমার অত্যাচার। নেপাল সকলকে এত ভাল বাসিত যে, তাহার সম্মুখে কোন অন্যায় কাজ করিতে কাহারও সাহস হইত না ; আর আমার অত্যাচারপ্রবৃত্তি এতই প্রবল ছিল যে, আমাকে ভয় না করিত এমন ছেলে ক্লাসে কেহ ছিল না। এমন কি, আমি কোন অত্যাচার করিলেও শিক্ষককে বলিয়া দিতে কেহ সাহস করিত না।

অভ্যাস মত এক দিন আমি মণিরামকে ধরিয়া দুই চারি ঘা দিতেছি, এমন সময় নেপাল আসিয়া বলিল, "দেখ ভাই, মণিরাম একে ছোট, তাতে আবার ভয়ানক রোগা। আর তুমি তার চেয়ে কত বড়, তোমার গায়ে জোরও কত বেশী ! মণিরামকে মারা কি তোমার ভাল দেখায় ?"

"আচ্ছা, আচ্ছা, সে বিষয়ে তোমার কোন কথা বল্‌বার দরকার নেই ! জ্যেষ্ঠতাতের মত উপদেশ দিতে এসেছে ! মণিরামকে মার্‌ছি, মণিরাম বুঝ্‌বে ; মাঝে থেকে তোমায় ফোড়ন দিতে ডাকলে কে ?" এই বলিয়া রাগের চোটে আমি মণিরামের ঘাড় ধরিয়া ঠেলিয়া দিলাম।

আমার অভদ্র ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া, নেপাল সেখান হইতে চলিয়া গেল। কিন্তু আমার কথার কোন উত্তর না দিয়া, তাহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া, আমি ভাবিলাম, নেপাল নিশ্চয়ই ভীরু। ভীরু না হইলে সে কখনই চুপ করিয়া চলিয়া যাইত না !

সেই দিন হইতে নেপালের উপর আমার রাগ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। ক্লাসের অন্যান্য বালকদের উপর আমি এত দিন যেরূপ প্রভুত্ব করিয়াছি, মিথ্যা ভয়ে নেপালের উপর তেমন করিতে সাহস করি নাই বলিয়া, মনে মনে খুব কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। ভাবিলাম, এবার

সুবিধা পাইলেই নেপালকে উত্তম মধ্যম ঘা কতক দিতে হইবে। তখন হইতে নেপাল যাহাতে চটে, আমি খুঁজিয়া খুঁজিয়া সেইরূপ কাজ করিতে লাগিলাম।

ঝগড়া বাধাইবার জন্য বড় বেশী দিন অপেক্ষা করিতে হইল না। আমাদের স্কুলে যাইবার পথে এক কৃষকের উঠানে বড় বড় কয়েকটা গাছ সেই সময়ে লীচুতে ভরিয়া গিয়াছিল। এক দিন স্কুলে আমরা কয়েক জনে মিলিয়া পরামর্শ করিলাম যে, সেই দিন বাড়ী আসিবার সময় লীচু চুরি করিয়া খাইতে হইবে। আমাদের মধ্যে মণিরাম বেশ গাছে উঠিতে পারিত। আমি তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম, "দেখ্, আজ লীচু চুরি কর্‌তে হবে, তুই গাছে উঠ্‌বি, আমরা নীচে থেকে পাহারা দিব।" মণিরাম ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আচ্ছা।"

স্কুলের ছুটী হইলে আমরা দল বাঁধিয়া, কৃষকের লীচুগাছের তলায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কৃষক তখন বাড়ীতে ছিল না। আমি মণিরামকে গাছে তুলিয়া দিয়া সকলকে পাহারা দিতে বলিলাম। মণিরাম সবেমাত্র দশ বারটা লীচু পাড়িয়াছে, এমন সময় বৈদ্যনাথ আসিয়া বলিল, "ও হে মোহনলাল, ব্যাপার বড় সহজ নয়! নেপাল ও আরও কয়েকজন ছেলে এই দিকে আস্‌ছে। বোধ হয় মারামারি হতে পারে।" আমি বলিলাম, "কি, নেপাল আস্‌ছে? আসুক, আজ তাকে একবার দেখ্‌বো! তোমরা এই দিকে থাকো, আমি ঐ বড় গাছটার আড়ালে লুকিয়ে থাকি; খবরদার, তোমরা যেন ভয় পেও না। আমি ঠিক্ সময়ে বাইরে এসে নেপালকে দুই চার্ ঘা কসিয়ে দেবো। তোমরা তাহার চেলাদের মাথায় চড়টা চাপড়টা লাগিয়ে দিতে যেন ভুলো না।" আমার কথায় সকলে রাজি হইল; আমি গাছের আড়ালে গিয়া লুকাইলাম।

একটু পরেই নেপালের দল গাছতলায় আসিয়া উপস্থিত হইল। মণিরাম তখন ভয়ে নামিয়া আসিবার উদ্যোগ করিতেছিল। তাহাকে দেখিতে পাইয়া নেপাল বলিল, "ছিঃ মণিরাম, তোমার এই কাজ? আমি তোমার মাকে এই কথা বলে দেবো।"

মণিরাম ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "না ভাই, আমার কোন দোষ নেই, আমি মারের ভয়ে লীচু চুরি কর্‌তে এসেছি।"

নেপাল। তা আমি জানি, তোমাকে কে লীচু চুরি কর্‌তে বাধ্য করেছে, তা বুঝ্‌তে আমার বাকী নেই। ছিঃ! ছিঃ! ভদ্রলোকের ঘরে জন্মে, শেষে কি না চোর হ'তে হ'ল! এর চেয়ে লজ্জার বিষয় আর কি আছে?

নেপালের কথা শেষ হইতে না হইতে বৈদ্যনাথ সগর্ব্বে বলিয়া উঠিল, "সাবধানে কথা বল, অত বাড়াবাড়ি ভাল নয়।"

নেপালের দলে গোপীনাথ নামে একটা ছেলে ছিল। তাহার চেহারা যেমন গুণ্ডার মত, তাহার গায়ের জোরও তেমনি খুব বেশী। সে বৈদ্যনাথের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "কি বল্লি, সাবধান হব? কেন, তোরা মারবি না কি? আয় না, কার ঘাড়ে ক'টা মাথা দেখি?" এই বলিয়া গোপীনাথ যেই একটু অগ্রসর হইল, লিখিতে লজ্জা হয়, আমার দলের সকলেই অমনি প্রাণভয়ে দৌড় দিল। দলের ছেলেদের কাণ্ড দেখিয়া আমি যার পর নাই দুঃখিত হইলাম। এক একবার ভাবিলাম, ছুটিয়া গিয়া নেপালের মুখে এক ঘুসী লাগাই। কিন্তু গোপীনাথের ভয়ে আমার সে সাহস হইল না। আমি যেমন লুকাইয়া ছিলাম, তেমনই রহিলাম। তখন নেপাল মণিরামকে ডাকিয়া বলিল, "মণিরাম, গাছ থেকে নেমে বাড়ী যাও, এমন কাজ আর কখন ক'র না।"

মণিরাম ধীরে ধীরে নামিয়া বাড়ীর দিকে চলিল। নেপালের দলও অন্য একটী রাস্তা দিয়া চলিয়া গেল। তাহারা অনেক দূর গেলে পর আমি তাড়াতাড়ি বাড়ী চলিলাম। যাইতে যাইতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, "নেপালকে এর প্রতিশোধ দিব! তা যদি না পারি, আমার মোহনলাল নাম মিথ্যা!"

ইহার পর কয়েক দিনের মধ্যেই নেপালকে মারিবার সুযোগ উপস্থিত হইল। একদিন আমি নদীর ধারের রাস্তা দিয়া স্কুল হইতে যাইতে যাইতে, তলায় বই রাখিয়া একটা গাছে পাখীর ছানা পাড়িতে উঠিয়াছি, এমন সময় নেপাল, মণিরাম এবং আমাদের ক্লাসের আরও কয়েকটী ছেলে সেখানে আসিল। গাছের তলায় বই দেখিয়া নেপাল বলিয়া উঠিল, "এই দেখ, কোন্ আহাম্মুক ছেলে তার বই ফেলে গেছে! খুলে দেখ ত কার বই?"

আমি গাছের উপর হইতে বলিলাম, "কি এত বড় আস্পর্দ্ধা, তুই আমাকে আহাম্মুক বল্লি? দাঁড়া তোকে দেখাচ্ছি!" এই বলিয়া আমি তিন চারিটা ডিম শুদ্ধ পাখীর বাসাটা নেপালের মুখের উপর ছুড়িয়া দিলাম। ডিমগুলো ভাঙ্গিয়া গিয়া তাহার নাক মুখ রসে ভরিয়া গেল; নেপালের মুখের শ্রী দেখিয়া সকলে হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। আমি তাড়াতাড়ি নামিয়া তাহার কাছে গিয়া বলিলাম, "এখন তোর গোপীনাথ গেল কোথায়? সে দিন যে বড় মারামারি করতে এসেছিলি? যদি মানুষ হ'স্ আয়, কে কা'কে মার্‌তে পারে দেখি?"

"মারামারি করা ভদ্রলোকের কাজ নয়! যতক্ষণ ভাল কথায় চলে, ততক্ষণ মারামারি না করাই উচিত। কিন্তু তুমি ক্রমেই যেরূপ বেড়ে উঠ্‌ছ, তোমাকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার। আমি মিষ্ট কথা বলে দেখেছি, ভাল ব্যবহার করে দেখেছি, তুমি

কিছুতেই শুন্‌লে না। যেন মারামারি করাই তোমার উদ্দেশ্য! যদি তাই হয়, এস দেখা যাক্।" এই বলিয়া নেপাল তাহার জামার আস্তিন গুটাইতে লাগিল।

আমি আর কালবিলম্ব না করিয়া ছুটিয়া নেপালকে গিয়া আক্রমণ করিলাম; এবং তাহার মুখ লক্ষ্য করিয়া সজোরে এক ঘুসী লাগাইলাম। নেপাল হঠাৎ মাথা সরাইয়া লইয়া সেই ঘুসী এড়াইল। চক্ষের নিমেষে আমি তখনই আবার বাঁ হাত দিয়া আর একটা ঘুসী মারিলাম, সেটাও তাহার গায়ে লাগিল না। রাগে ও ঘৃণায় উত্তেজিত হইয়া, আমি আবার তাহাকে মারিবার উপক্রম করিতেছি, অমনি নেপালের প্রকাণ্ড এক ঘুসী ঠিক আমার নাকের উপর আসিয়া পড়িল। সে ত ঘুসী নয়, যেন লোহার মুগুর! আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। মাথা ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, নেপালের সহিত ঘুসীতে আঁটিয়া উঠা সহজ নয়। সে একজন রীতিমত পালোয়ান। তখন আমি "যাক্ প্রাণ, থাক্ মান" মন্ত্র জপিতে জপিতে একেবারে মরিয়া হইয়া তাহার দিকে ছুটিয়া গেলাম। নেপাল চক্ষের নিমেষে অমনি একধারে একটু সরিয়া দাঁড়াইল; আমি বেগ সাম্‌লাইতে না পারিয়া সম্মুখের নদীতে পড়িয়া গেলাম। নদীটী তত বড় না হইলেও খুব

গভীর ছিল। আমি সাঁতার জানিতাম না, নদীতে পড়িয়া অাঁকুর পাঁকুর করিতে করিতে, ভাসিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহা পারিলাম না। ক্রমেই ডুবিতে লাগিলাম। তার পর প্রায় আমি ডুবিয়া গিয়াছি, এমন সময় নেপাল নদীতে লাফাইয়া পড়িয়া, আমাকে ধরিয়া ফেলিল। আমিও তাহার কাপড় ধরিয়া ফেলিলাম। নেপাল বলিল, "মোহনলাল, তোমার কোন ভয় নেই, তুমি আমার কাপড় ছেড়ে দেও, আমি তোমাকে তীরে নিয়ে যাচ্ছি।" কিন্তু তাহার কাপড় ছাড়িতে আমার কিছুতেই সাহস হইল না, কি জানি শত্রু ভাবিয়া সে যদি আমাকে ফেলিয়া চলিয়া যায়। আমার এই নির্ব্বুদ্ধিতায় লাভের মধ্যে এই হইল যে, আমরা দুইজনেই ডুবিতে লাগিলাম। শেষে নেপাল জোর করিয়া আমার হাত হইতে তাহার কাপড় ছাড়াইয়া লইল এবং অনেক কষ্টে আমাকে লইয়া ভাসিতে ভাসিতে ক্রমে তীরে আসিয়া উঠিল। এইরূপে আমি সে যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম।

কিন্তু কুশিক্ষার এমনই দোষ যে, এ সময়েও আমি নেপালকে ভাল চক্ষে দেখিতে পারিলাম না! সে যে আপনাকে এত বিপদে ফেলিয়া, আমার জীবন রক্ষা করিল, সে জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাক্, বরং অপমানে যেন আমি মরিয়া গেলাম! নেপাল এই ঘটনা লইয়া যেখানে যেখানে গর্ব্ব করিবে, আর সকলের কাছে আমার মাথা হেঁট হইবে, এর চাইতে লজ্জা এবং অপমানের বিষয় আর কি আছে? ইহা অপেক্ষা নদীর জলে ডুবিয়া মরা সহস্র গুণে ভাল ছিল! এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আমি বাড়ী চলিয়া গেলাম।

(ক্রমশঃ)

সাত-ভাই চম্পা

সাতটি চাঁপা সাতটি গাছে, সাতটি চাঁপা ভাই;
রাঙ্গা-বসন পারুল দিদি, তুলনা তার নাই।
সাতটি সোনা চাঁপার মধ্যে সাতটি সোনা মুখ,
পারুল দিদির কচি মুখটি কর্ত্তেছে টুক্‌টুক্!
ঘুমটি ভাঙ্গে পাখীর ডাকে, রাতটি যে পোহালো,
ভোরের বেলা চাঁপায় পড়ে চাঁপার মত আলো।
শিশির দিয়ে মুখটি মেজে মুখখানি বের করে।
কি দেখ্‌ছে সাত ভায়েতে সারা সকাল ধ'রে।

দেখ্‌চে চেয়ে ফুলের বনে গোলাপ ফোটে ফোটে,
পাতায় পাতায় রোদ পড়েছে, চিক্‌চিকিয়ে ওঠে।
দোলা দিয়ে বাতাস পালায় দুষ্টু ছেলের মত,
লতায় পাতায় হেলাদোলা কোলাকুলি কত!
গাছটি কাঁপে নদীর ধারে, ছায়াটি কাঁপে জলে,
ফুলগুলি সব কেঁদে পড়ে শিউলি গাছের তলে।
ফুলের থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখ্‌চে ভাই বোন্,
দুখিনী এক মায়ের তরে আকুল হল মন।
সারাটা দিন কেঁপে কেঁপে পাতার ঝুরু ঝুরু,
মনের সুখে বনের যেন বুকের দুরু দুরু!
কেবল শুনি কুলুকুলু এ'কি ঢেউয়ের খেলা!
বনের মধ্যে ডাকে ঘুঘু সারা দুপুর বেলা।
মৌমাছি সে গুন্‌গুনিয়ে খুঁজে বেড়ায় কা'কে,
ঘাসের মধ্যে ঝিঁ ঝিঁ ক'রে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকে।
ফুলের পাতায় মাথা রেখে শুন্‌চে ভাই বোন,
মায়ের কথা মনে পড়ে আকুল করে মন।

মেঘের পানে চেয়ে দেখে মেঘ চলেছে ভেসে,
পাখীগুলি উড়ে উড়ে চলেছে কোন্ দেশে!
প্রজাপতির বাড়ী কোথায় জানে না ত কেউ।
সমস্ত দিন কোথায় চলে লক্ষ হাজার ঢেউ!
দুপুর বেলা থেকে থেকে উদাস হ'ল বায়,
শুক্‌নো পাতা খসে প'ড়ে কোথায় উড়ে যায়!
ফুলের মাঝে গালে হাত দেখ্‌চে ভাই বোন,
মায়ের কথা পড়চে মনে কাঁদ্‌চে প্রাণ মন।
সন্ধে হলে জোনাই জ্বলে পাতায় পাতায়,
অশথ গাছে দুটি তারা গাছের মাথায়।
বাতাস বওয়া বন্ধ হল, স্তব্ধ পাখীর ডাক,
থেকে থেকে কর্‌চে কা কা দুটো একটা কাক!
পশ্চিমেতে ঝিকিমিকি, পূবে আঁধার করে,
সাতটি ভায়ে গুটিসুটি চাঁপা ফুলের ঘরে!
"গল্প বল পারুল দিদি" সাতটি চাঁপা ডাকে,
পারুল দিদির গল্প শুনে মনে পড়ে মাকে।
প্রহর বাজে, রাত হয়েছে ঝাঁঝাঁ করে বন,
ফুলের মাঝে ঘুমিয়ে প'ল আট্‌টি ভাই বোন।
সাতটি তারা চেয়ে আছে সাতটি চাঁপার বাগে,
চাঁদের আলো সাতটি ভায়ের মুখের পরে লাগে।
ফুলের গন্ধ ঘিরে আছে সাতটি ভায়ের তনু—
কোমল শয্যা কে পেতেছে সাতটি ফুলের রেণু।
ফুলের মধ্যে সাত ভায়েতে স্বপন দেখে মাকে;
সকাল বেলা "জাগো জাগো" পারুল দিদি ডাকে।

মশার যুদ্ধ।

ছেলে বেলা গল্প শোনা রোগটা প্রায় সকলেরই দেখা যায়। আমিও ছেলে বেলা দাদা-মশাইকে প্রায় প্রতিদিন নূতন নূতন গল্প বলিবার জন্য জ্বালাতন করিয়া মারিতাম। একদিন সন্ধ্যার পর আমরা সব ভাই বোনে একত্র হইলে, তিনি আমাদিগকে মশার গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন।

এক নদীর ধারে বনের ভিতর একদল মশা বাস করিত। মশারা বেশ গান করিতে পারে, তাহা বোধ করি তোমরা জান। এক বেঙ সেই গান শুনিয়া মোহিত হইয়া গেল। থপ্ থপ্ করিয়া লাফাইয়া সে প্রতিদিনই মশাদের গান শুনিতে আসিত। ক্রমে মশাদের রাজার সহিত বেঙের খুব বন্ধুত্ব হইল। এখন তাহাদের মজা দেখে কে? কখন মশারা গান গায় সে শুনে, আবার কখন সে গায় আর মশারা বাঁশী বাজাইতে থাকে। এইরূপ করিয়া কিছুকাল বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিল। তার পর এক দিন বেঙের বাপের শ্রাদ্ধ উপস্থিত। সে বৎসর বড় দুর্ব্বৎসর; চাষ বাস কিছুই হয় নাই। বেঙের ঘরে পয়সার নিতান্তই অভাব; অথচ ষোড়শোপচারে পিতৃশ্রাদ্ধ করা প্রয়োজন। নচেৎ লোকে বলিবে কি? বেঙ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, শেষে মশাদের রাজার নিকট হইতে এক লক্ষ টাকা ধার করিয়া, পিতৃদায় হইতে উদ্ধার পাইল। তার পর অনেক দিন চলিয়া গেল, বেঙ আর মশাদের কাছে যায় না, কিম্বা দেনা শোধের নামও করে না। মশাদের রাজা কতবার বেঙের কাছে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু দেনা শোধ করা দূরে থাক্ বরং সে লোকগুলাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিল। রাজা প্রমাদ গণিয়া একদিন নিজেই গুণ গুণ করিতে করিতে, বেঙের কাছে উপস্থিত হইলেন, এবং বলিলেন,—"কুঁণো ব্যাং,—কুঁণো ব্যাং,—আঁমাঁর কঁড়িঁ দাঁও,—আঁমাঁর কঁড়িঁ দাঁও।" বেঙ গর্ত্তের ভিতর হইতে উত্তর করিল—"গ্যাঁ গোঁ—গ্যাঁ গোঁ,—কেঁ-কাঁর-কঁড়ি-ধাঁরে!" মশকরাজ দেখিলেন বড়ই মুস্কিল! ধূর্ত্ত বেঙ তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে। যাহা হউক দুষ্টের দমন করিতেই হইবে, এই ভাবিয়া তিনি তখনই উড়িতে উড়িতে সাপেদের রাজার নিকট উপস্থিত

হইলেন ; এবং তাঁহার কাছে বেঙের নামে নালিশ করিলেন ! ধূর্ত্ত বেঙের বিশ্বাস-ঘাতকতায় সাপ মহা চটিয়া গেল এবং—"রোস্‌সো—আস্‌সি, রোস্‌সো—আস্‌সি"—বলিয়া ফণা না ড়িতে না ড়িতে

চক্ষের নিমেষে ছুটিয়া আসিয়া বেঙটাকে ধরিয়া ফেলিল। সাপ যতই তাহাকে গিলিতে লাগিল, বেঙটাও ততই কাতর ভাবে,—অ্যাঁ, গিঁলিঁশ্‌নে ভাই, কঁড়ি নেঁ—অ্যাঁও, গিঁলিঁশ্‌নে ভাই, কঁড়ি দিঁ—বলিতে বলিতে, ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া পড়িল। শেষে সাপের পেটের মধ্যে আপনার জীবন হারাইল।

গল্পটী শুনিয়া আমরা হাসিয়া লুটোপুটি খাইতে লাগিলাম। দাদামশাই বলিলেন, "এ ত গেল গল্প ! এখন মশাদের যুদ্ধের একটা সত্য গল্প বলিতেছি, শুন।" এই বলিয়া তিনি আবার আরম্ভ করিলেন।

সে অনেক দিনের কথা, বর্দ্ধমানে যাইবার জন্য একদিন বিকালে আমি বাড়ী হইতে বাহির হইলাম। ইচ্ছা করিলে রেলগাড়ীতে চড়িয়া যাইতে পারিতাম, কিন্তু পথে নানাস্থান দেখিতে দেখিতে যাইব ভাবিয়া, রেলগাড়ীতে উঠিলাম না। আমি খুব খানিকদূর গিয়া একজন লোককে আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাই, বর্দ্ধমান সহর আর কতদূর ?"

"আপনি বর্দ্ধমানে যাবেন ? রেলে গেলেন না কেন ? হেঁটে আজ বর্দ্ধমানে পৌছান অসম্ভব, বিপদের আশঙ্কাও আছে।" এই বলিতে বলিতে সেই লোকটা চলিয়া গেল।

আমি অনেক দিন সেই পথে সহরে যাই নাই সত্য, কিন্তু রাস্তাটা একেবারে আমার অপরিচিত ছিল না। আমি পথিকের কথায় হতাশ না হইয়া, খুব তাড়াতাড়ি চলিতে আরম্ভ করিলাম। তখন সূর্য্য একেবারেই ডুবিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তখনও খুব অন্ধকার হয় নাই। আমি একটা ছোট জঙ্গল পার হইয়া, খোলা মাঠে পৌছিয়াই বর্দ্ধমানের সাদা সাদা বাড়ী দেখিতে পাইলাম। "আর কি! এই ত এসেছি!" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আমি চলিতে লাগিলাম। সম্মুখের পথ অনেক দূর পর্য্যন্ত বেশ পরিষ্কার, কেবল সহরের নিকটে

একটা ঘন জঙ্গল ছিল। সেই জঙ্গল পার হইয়া, একটু গেলেই সহরের রাজপথে উপস্থিত হওয়া যায়। চলিতে চলিতে আমি প্রায় সেই জঙ্গলের কাছে গিয়াছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম, একখানা গরুর গাড়ী আসিতেছে। গাড়ীখানা খুব কাছে আসিলে, গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হে বাপু, বৰ্দ্ধমান সহর আর কতদূর বলতে পার?"

"আপনি এই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে বৰ্দ্ধমানে যাবেন?"

"হ্যাঁ, এইটেই ত সোজা রাস্তা।"

আমার কথা শুনিয়া লোকটা মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল, "মহাশয় এ পথে যাবেন না, এ পথে গেলে আজ রাতে সহরে পৌঁছান দূরে থাক্, আপনার জীবন রক্ষা হবে কি না সন্দেহ!"

তাহার কথায় আমি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে কি? এ রাস্তায় কিসের ভয়? পথে ডাকাত আছে না কি?"

"ডাকাত? লাখো লাখো ডাকাত এই জঙ্গলে বসত করে। সাবধান, আপনি আর এক পাও এগোবেন না।—ঐ শুনুন!—তাহারা চীৎকার করছে!"

তাহার কথায় আমি মনোযোগের সহিত কাণ পাতিয়া ঝিঁ ঝিঁ পোকার চীৎকার ও মধ্যে মধ্যে কুকুরের অতি ক্ষীণ ডাক শুনিতে পাইলাম। কিন্তু ইহাতে ভয় করিবার কি আছে, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। গাড়োয়ান আমার ভাবগতিক দেখিয়া বলিল;—"কিছুই শুনতে পেলেন না? বোধ করি তাহারা মাঝে একবার চুপ করেছিল। আচ্ছা, আবার খুব মন দিয়ে শুনুন দেখি!"

এইবারে আমি ভয়ানক কর্কশ এক প্রকার শব্দ শুনিতে পাইলাম। অসংখ্য মশা এক সুরে শব্দ করিলে যেমন বোধ হয়, এও সেই প্রকার। সমুদায় জঙ্গল হইতে সেই ভয়ানক স্বর আমার কাণে আসিতে লাগিল। আমি বলিলাম, "তুমি কি মশার কথা বলছ?"

"আজ্ঞে মশার কথাই বলছি। যদি প্রাণে বাঁচবার সাধ থাকে, সহরে যাবার ইচ্ছে ছেড়ে দিয়ে, এখনই আমার সঙ্গে ফিরে চলুন।"

"কি, মশার ভয়ে আমি আমার সঙ্কল্প ত্যাগ করব? তুমি তামাসা করছ না কি?"

"আচ্ছা, তবে যান, কাজটা কিন্তু ভাল করলেন না!"

আমি তাহাকে পাগল মনে করিয়া, দ্রুতপদে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। একটু পরেই দেখি, ঝাঁকে ঝাঁকে মশা ঘন মেঘের ন্যায় আমাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। আমি যত তাড়াতাড়ি যাই, তাহারা তাহা অপেক্ষাও ছুটিয়া নিষ্ঠুরভাবে আমাকে দংশন করিতে

লাগিল। আমি আমার হাতে, মুখে, পায়ে চাপড় মারিয়া এক একবারে দশ বারটা মশা মারিতে লাগিলাম, কিন্তু পরক্ষণেই শত শত মশা আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিল। আমি যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, মশার দলও ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শেষে মশার ঝাঁক এত বাড়িয়া গেল যে,

আমার নাক মুখ, কাণ সব মশাতে ভরিয়া গেল। আর তাহাদের দংশনে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। শুধু হাতের সাহায্যে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব ভাবিয়া, আমি তাড়াতাড়ি একটা গাছের ডাল কাটিয়া লইলাম, এবং শরীরের চারিদিকে লাটীর ন্যায় সেই ডাল ঘুরাইয়া মশা তাড়াইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। বহুকাল উপবাসের পর, তাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটিয়া আসিয়া, পেট ভরিয়া আমার গায়ের রক্ত শুষিতে লাগিল। আর রক্ষা নাই দেখিয়া, আমি গাছের ডালটা ফেলিয়া দিয়া ছুটিতে লাগিলাম; কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই। সেই নিষ্ঠুর পতঙ্গেরাও দলে দলে আমার পশ্চাতে ছুটিতে লাগিল, আর সম্মুখ হইতেও অগণ্য মশা আসিয়া তাহাদের সহিত যোগ দিল। আমার হাত, মুখ সব রক্তে ভাসিয়া গেল। তার পর ছুটিতে ছুটিতে কোথায় গেলাম, কি হইল, এ সব কথা আমার একটুও মনে নাই। শেষে যখন অল্প অল্প চেতনা হইল, তখন দেখিলাম, আমি সহরের একটা রাস্তার পাশে পড়িয়া আছি। আমার সমুদায় শরীর ফুলিয়া উঠিয়াছে, চক্ষে তেমন তেজ নাই, আর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছে। আমি অনেক কষ্টে সেখান হইতে উঠিয়া, সেই রাত্রে একটা হোটেলে গিয়া আশ্রয় লইলাম।

ইহার পর তিন দিন আমি শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিতে পারি নাই। তিন দিন পরে ঘরের বাহির হইতে পারিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিতে প্রায় দুই মাস লাগিয়াছিল। এই ঘটনার পর হইতে মশা দেখিলেই আমার ভয় হয়। ইহারা সামান্য প্রাণী বটে, কিন্তু এইরূপ সামান্য প্রাণীর হাত হইতে রক্ষা পাওয়াও সকল সময়ে সহজ নহে।

তাজমহল।

পাঠক পাঠিকাগণ ! তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয় ত আগ্রার তাজমহলের কথা শুনিয়া থাকিবে। এই তাজমহলের মত সুন্দর শিল্প-নৈপুণ্যপূর্ণ অট্টালিকা পৃথিবীর আর কোথায়ও নাই। মোগল বাদসাহ সাজাহান ১৬৪৮ সালে তাঁহার প্রিয়তমা বেগম মমতাজ বিবির সমাধির উপর এই মনোহর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। সেই জন্য ইহার অন্য একটী নাম "মমতাজমহল" ছিল, এখন ইহা "তাজমহল" নামেই প্রসিদ্ধ। এই সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে বিশ সহস্র শিল্পী ক্রমান্বয়ে সতের বৎসর কাল পরিশ্রম করিয়াছে; এবং ইহাতে প্রায় দুই কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। আগ্রা সহর হইতে এক ক্রোশ দূরে যমুনার তীরে এই অপূর্ব্ব অট্টালিকা বিদ্যমান। সুবৃহৎ রক্তপ্রস্তর নির্ম্মিত ফটকের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়াই সম্মুখে একটী শ্বেতপ্রস্তরের ক্ষুদ্র পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়; পুষ্করিণীর পার্শ্ব দিয়া তাজমহলে যাইবার পথ। সেই পথের দুই পার্শ্বে নানা জাতীয় তরুলতা অবস্থিতি করিতেছে। তাজমহলের তিন দিক এইরূপ মনোহর উদ্যানে বেষ্টিত; আর এক দিকে যমুনা নদী। সম্মুখের ফটকের ন্যায় ইহার অপর দুই দিকেও দুইটী সুবৃহৎ ফটক শোভা পাইতেছে। শ্বেত ও রক্তপ্রস্তর নির্ম্মিত ত্রিতল ভিত্তির উপরে তাজমহল অবস্থিত। ইহার চারি কোণে চারিটী স্তম্ভ। সমুদায় অট্টালিকাটী বহুমূল্য শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত, প্রাচীরের উপর চারিদিকে নানা বর্ণের ফুল পাতা খোদিত। এই সকল ফুল পাতা এমন স্বাভাবিক, এবং এমন সুন্দর যে, কিছুতেই মনুষ্যহস্ত নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয় না। মনে হয়, প্রকৃতি দেবী যেন স্বয়ং অপূর্ব্ব তাজমহলের সর্ব্বাঙ্গ নানা বর্ণের সদ্যঃপ্রস্ফুটিত কুসুমহারে শোভিত করিয়াছেন !

তাজমহলে প্রবেশ করিবার দরজা চন্দন কাষ্ঠে নির্ম্মিত। পূর্ব্বে দুইখানি রূপার কপাট ছিল। সেই কপাট দুইখানিতে দশ সহস্রেরও অধিক প্রেক ছিল, তাহার প্রত্যেকটীর মাথায় এক একটী মোহর বসান ছিল। কিন্তু এখন আর সে সকল কিছুই নাই। বহু বৎসর পূর্ব্বে জাঠেরা তাহা লুট করিয়া গলাইয়া ফেলিয়াছে।

তাজমহলের সর্ব্বনিম্নতলে রাজ্ঞী মমতাজের সমাধি, তাহার পার্শ্বেই সাজাহানের সমাধি। সেই সমাধি স্থানটীও যার পর নাই সুন্দর।

তাজমহল দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হন না, এমন ব্যক্তি জগতে কে ? দেশ বিদেশের কত সৌন্দর্য্য-পিপাসু নর নারী যে এই মনোহর অট্টালিকা দেখিয়া মোহিত হইয়াছেন,
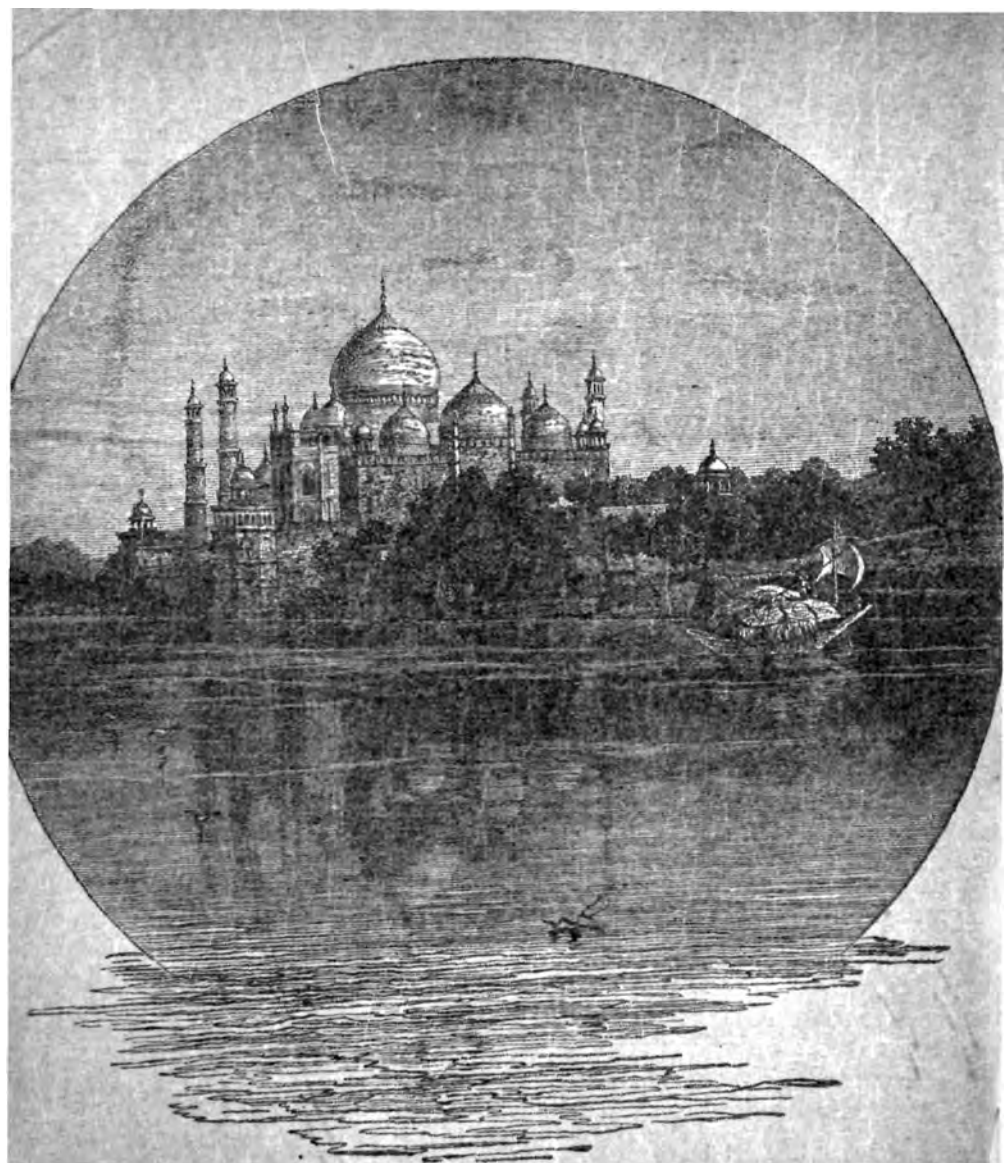
"তাজমহলের মত সুন্দর শিল্প-নৈপুণ্য-পূর্ণ অট্টালিকা পৃথিবীর আর কোথায়ও নাই।"

তাহার সংখ্যা নাই! শুভ্র জ্যোৎস্নাপূর্ণ রজনীতে তাজের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে মনে হয়, যেন পৃথিবীর সীমা ছাড়াইয়া আমরা এক অদ্ভুত মায়া-রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছি। সেখানে সকলি সুন্দর, সকলি মধুর! কোন ইংরাজ কবি লিখিয়াছেন, "তাজমহল প্রস্তর নির্ম্মিত কবিতা বিশেষ।" বাস্তবিক যে একবার স্বচক্ষে তাজ দেখিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে, এমন শোভা জগতে আর নাই!

পরাজয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বাড়ী আসিলে নেপালের প্রতি আমার অন্যায় ব্যবহারের কথা শুনিয়া, মা আমাকে যার পর নাই তিরস্কার করিলেন, তার পর কয়েকজন আত্মীয় স্বজনের সহিত পরামর্শ করিয়া, আমাকে কলিকাতায় পাঠান স্থির করিলেন। ১২৮২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে পনর বৎসর বয়সের সময় আমি মামার সহিত কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এত বয়স পর্য্যন্ত আমি কখনও বাড়ীর বাহির হই নাই। সেই জন্য ট্রেণে উঠিয়া প্রথম প্রথম আমার খুব কষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু কলিকাতায় পৌছিবার পরে, দিন কয়েক মামার সঙ্গে চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, গড়ের মাঠ, কেল্লা প্রভৃতি দেখিয়া, সে কষ্টের অবসান হইল। রোজ সকালে বিকালে চারিদিক থেকে কত বাঁশী বাজে, কত হারমোনিয়ম বাজে, কত গোরার বাজ্না বাজাইয়া, রোস্নাই করিয়া বিয়ে যায়, এই সব আমার কাছে খুব নূতন বোধ হইতে লাগিল। মামা আমাকে একটী বোর্ডিং স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া, এক সপ্তাহ পরে দেশে ফিরিয়া গেলেন। আমি বোর্ডিংএর ভাল ছেলেদের ত্রিসীমায় ঘেঁসিতাম না। কয়েকটী ওঁচা ছেলে আমার সঙ্গী হইল। আমি তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া লুকাইয়া লুকাইয়া, চুরট খাইতে শিখিলাম। বড় বড় "হনি সোপ" কিনিয়া গায়ে মাখিতাম আর প্রত্যহ একঘণ্টা ধরিয়া, ঝাঁঝ্রা কলের নিচে মাথা পাতিয়া, আনন্দে স্নান করিতাম। তার পর আরসী ক্রশ লইয়া, আলবার্ট কাটিয়া চুল ফিরাইতাম। ভাল ভাল চুনট্ করা কামিজ, চীনের বাড়ীর বার্ণিস করা হাপ জুতা, হাপ মোজার উপর গার্টার এই সব অষ্টপ্রহর পরিয়া বাবুগিরি করিতাম। বোর্ডিংএ আমার স্বেচ্ছাচারিতা ক্রমশঃই বাধা পাইতে লাগিল। বোর্ডিং স্কুলের বাঁধাবাঁধি নিয়মের মধ্যে বাস করায় যে কত সুখ, তাহা মনে হইলে এখনও আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এক মাস যাইতে না যাইতে, আমি পুনঃ পুনঃ সাত বার নিয়মভঙ্গ অপরাধে তিরস্কৃত হই। বোর্ডিংএ আমার সমবয়স্ক আরও কয়েকটী ছেলে ছিল। তাহাদের মধ্যে

রমানাথই সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্টামীতে পাকা। তাহার সহিত আমার খুব ভাব হইল। আমাদের পরস্পরের মধ্যে এত ভাব দেখিয়া, হেডমাষ্টার মহাশয় নিয়ম করিয়া দিলেন যে, আমরা কেহ কাহারও সহিত কথা বলিতে পারিব না। কিন্তু মাষ্টারের চক্ষে ধূলি দিবার শক্তি আমাদের যথেষ্ট ছিল! আমরা গোপনে গোপনে একত্র হইয়া সর্ব্বপ্রকার দুষ্টামীর মৎলব আঁটিতে লাগিলাম। লেখা পড়াও যে কিছুই শিখিলাম না এমন নয়। তখন আমি গড়্ গড়্ করিয়া 'রয়েল রীড়ার থ্রী' পড়িতে পারিতাম এবং এক টানে আমার নাম লিখিতে পারিতাম; অঙ্কশাস্ত্রের জ্ঞানও নিতান্ত কম হয় নাই, হড়্ হড়্ করিয়া, কুড়ির কোটা পর্য্যন্ত নাম্‌তা মুখস্ত বলিতে পারিতাম। এইরূপ একটু লেখা পড়া এবং নানারকম নূতন নূতন দুষ্টামী শিখিয়া আমি পূজার ছুটীর সময় বাড়ীতে আসিলাম। পূজার কয়দিন বেশ কাটিয়া গেল, মা কিছুই বলিলেন না। কিন্তু বিজয়ার পরদিনই মা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মোহনলাল, এই কয় মাস কল্‌কাতায় থেকে তুমি তোমার মাষ্টার মশাইয়ের এবং বোর্ডিংএর ছেলেদের সঙ্গে যে রূপ ব্যবহার করেছ, তা সবই আমি শুনেছি। তোমার মামাকে মাষ্টার মশাই যে পত্র লিখেছেন, তা আমি দেখেছি। তুমি আর ছেলে মানুষ নও, বড় হয়েছ; কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, তুমি এত বড় হ'লে, তবুও কুসংসর্গ ছাড়্‌তে পারলে না! যা হ'ক, আমি আর তোমাকে কিছু বল্‌ব না! তোমার যা ইচ্ছে তুমি তাই কর।" এই বলিয়া মা চক্ষে কাপড় দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মাকে কাঁদিতে দেখিয়া আমার কষ্ট হইল; কিন্তু মাকে সে কথা না বলিয়া, আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, মা যাহাতে কষ্ট পান, আর কখন তেমন কাজ করিব না। আমার ভাবগতিক দেখিয়া মাও বোধ করি ভাবিলেন যে, আমার সুমতি হইবার উপক্রম হইয়াছে। তার পর যে কয়দিন বাড়ীতে ছিলাম, আমার সে কয়দিনের ব্যবহার দেখিয়া মা যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। অবশেষে ছুটী শেষ হইয়া আসিলে, মা আমাকে আদর করিয়া, নানাপ্রকার সদুপদেশ দিয়া, আবার কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন।

ছুটীর পর বোর্ডিংএ ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, সব গোলমাল হইয়া গিয়াছে। আমি যে ঘরটীতে থাকিতাম, সে ঘর মেরামত হইতেছে, আমার জন্য অন্য একটী ঘরে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অন্যান্য কয়েক জন বালকের ঘরও বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। রমানাথ আমার আসিবার একদিন পূর্ব্বে বোর্ডিংএ ফিরিয়া আসিয়াছিল। আমি যে দিন আসি, সেই দিন বিকালে রমানাথ আসিয়া বলিল, "দেখ মোহনলাল, আজ একটা মজা কর্‌তে হবে, তাহাতে তোমার সাহায্য চাই। তুমি বোধ হয় জান, ছোট কুঞ্জ রাক্ষসের কথা শুন্‌লে বড় ভয় পায়। কেহ

রাক্ষসের গল্প বল্‌লে, কুঞ্জ তার কাছেও যায় না। আজ রাতে কুঞ্জকে নিয়ে একটু মজা করতে হবে। আমি দুটো রাক্ষসের মুখোস্ কিনে এনেছি। রেতে কুঞ্জ ঘুমুলে আমরা গায়ে রং মেখে, মুখোস্ পরে রাক্ষস সেজে, তাকে গিয়ে ভয় দেখাবো। কেমন, রাক্ষস সাজ্‌তে তুমি রাজি আছ ত?"

রমানাথের কথার কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মায়ের চক্ষের জলের কথা আমার মনে পড়িল। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলাম, ইহা ত দুষ্টামী নয়, একটু মজা করা মাত্র। সুতরাং এরূপ করাতে দোষ কি? এই ভাবিয়া রমানাথকে বলিলাম, "আচ্ছা, আমি রাক্ষস সাজ্‌বো, কিন্তু ভাই খুব সাবধান—মাষ্টার মশাই যেন টের না পান।"

"আরে, সে ভাবনা নেই! মাষ্টার মশাই আমাদের কোন্ কাজ্‌টাই বা জান্‌তে পারেন?" এই বলিতে বলিতে, রমানাথ অন্যত্র চলিয়া গেল।

রাত প্রায় বারটা বাজিলে, আমাদের ক্লাসের কয়েকজন ছেলে আমাদের দুজনকে বেশ করিয়া রাক্ষস সাজাইয়া দিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের বোর্ডিং মেরামত হইতেছিল; বাড়ীতে অনেক খড়ের দড়ী ছিল। সুতরাং আমাদের এক একটী লেজেরও অপ্রতুল হইল না। আমরা বিকট মূর্ত্তি ধরিয়া, বাতী হস্তে গভীর রাত্রে পা টিপিতে টিপিতে ছোট কুঞ্জর ঘরের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলাম। রমানাথ চাবি ঘুরাইবামাত্র দরজা খুলিয়া গেল। তখন বাতী নিভাইয়া ভূতের মত অন্ধকারের সহিত মিশিয়া গিয়া, আমরা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়াই পশ্চিম দিকের জানালা খুলিয়া দিলাম। ঘরে বেশ জ্যোৎস্নার আলো আসিয়া পড়িল। কুঞ্জর বিছানাটা ঘরের এক কোণে ছিল বলিয়া, কেবল সেই খানে আলো পৌঁছিল না। আমরা কুঞ্জর নাক ডাকার শব্দে বুঝিলাম, সে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত।

পূর্ব্বের বন্দোবস্ত অনুসারে রমানাথ ও আমি একেবারে লাফাইয়া কুঞ্জর উপরে গিয়া পড়িলাম। সে হাঁউ মাঁউ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল! ভয়ে তাহার কণ্ঠের স্বর একেবারে বদ্‌লাইয়া গিয়াছিল। সে যতই চীৎকার করিতে লাগিল, আমরাও ততই তাহাকে লেজের বাড়ী মারিতে মারিতে বিকট শব্দ করিয়া বলিলাম, "আঁমঁরাঁ রাঁক্ষঁসঁ, তোঁমাঁয় ধঁরেঁ নিঁয়েঁ যাঁবোঁ।"

আমাদের কথা শেষ হইতে না হইতে, কুঞ্জ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে, বিছানা হইতে উঠিয়া, জানালার ধারে জ্যোৎস্নাতে আসিয়া দাঁড়াইল। ও মা, কি সর্ব্বনাশ! এ করেছি কি? সহস্র বজ্র যেন একেবারে আমাদের মাথার উপর পড়িল! চারিদিক অন্ধকার বোধ হইতে লাগিল! এ ত কুঞ্জ নয়! এ যে দেখি, আমাদের হেড্‌মাষ্টার! হেড্‌মাষ্টারকে

দেখিয়া, আমাদের হাত পা সব আড়ষ্ট হইয়া গেল। কিন্তু তবুও আমরা প্রাণভয়ে ছুটিয়া আমাদের ঘরে আসিয়া লুকাইলাম!

সে রাতটা আমাদের যে কি ভাবে কাটিল, তাহা লিখিয়া জানাইতে পারি না। এমন কোন ভাষা পাই না, যাহাতে ঠিক আমাদের সেই সময়ের মনের ভাব প্রকাশ হয়। সকাল হইলে কি করিব, ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। আমরা গায়ের রং ধুইয়া, দু'টীতে মৃতবৎ পড়িয়া রহিলাম। মুখোস্ পূর্ব্বেই পোড়াইয়া ফেলিয়াছিলাম।

সকাল হইতে না হইতে, বোর্ডিংময় রাষ্ট্র হইল যে, দু'টী বালক মুখোস্ পরিয়া রাত্রে হেড্ মাষ্টারকে খুন করিতে আসিয়াছিল। সেই বালক দু'টী কে, জানিবার জন্য মাষ্টার মহাশয় বোর্ডিংএর সকল বালককে একত্র হইতে বলিলেন। আমরা যত দূর সম্ভব মনের ভাব গোপন করিয়া, সকলের সঙ্গে গিয়া বসিলাম; এবং যাহারা আমাদের কীর্ত্তি জানিত, ইঙ্গিতে তাহাদিগকে কোন

কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিয়া, নিতান্ত নিরীহ ব্যক্তির ন্যায়, আমরা মাষ্টার মহাশয়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

একটু পরেই বোর্ডিংএর সম্পাদক ও হেড্‌মাষ্টার মহাশয় সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং কে কে এরূপ অসমসাহসিক কার্য্য করিয়াছে, জানিতে চাহিলেন। কিন্তু বালকদিগের মধ্যে কেহই তাঁহাদের কথার উত্তর দিল না। তাঁহারা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বারেও কেহ কোন উত্তর দিল না। তখন তাঁহারা এক এক জন করিয়া এক দিক হইতে সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। প্রথম চার পাঁচটী ছেলে বলিল যে, তাহারা ইহার কিছুই জানে না। তার পর মাষ্টার মহাশয় পঞ্চানন নামে একটী ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেন। পঞ্চাননের সহিত রমানাথের খুব শত্রুতা ছিল। আমিও পঞ্চাননকে মনে মনে ঘৃণা করিতাম। মাষ্টার মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে পঞ্চানন দাঁড়াইয়া বলিল, "আমার বোধ হয়, রমানাথ এই কার্য্যের মধ্যে ছিল। কাল বিকালে তা'কে ছুটো মুখোস্ কিনে আন্‌তে দেখেছি।" পঞ্চাননের কথা শুনিয়া, ভয়ে আমাদের মুখ শুকাইয়া গেল, বুক গুর্ গুর্ করিতে লাগিল। বোর্ডিংএর সম্পাদক মহাশয় তখনই রমানাথের হাত ধরিয়া, টানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই কাজ করেছ?"

"আজ্ঞে না, আমি কিছুই জানি না," বলিয়া রমানাথ আত্মদোষ গোপন করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা। বেতের চোটে ছুই তিন মিনিটের মধ্যেই রমানাথ তাহার দোষ স্বীকার করিল; এবং আমার নামও প্রকাশ করিল। হেড্‌মাষ্টার মহাশয় আমাকেও হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া, সম্পাদকের কাছে লইয়া গেলেন। নরহত্যাকারীকে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলাইতে লইয়া যাইবার সময় তাহার মনের ভাব কিরূপ হয়, এই সময়ে আমি তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম! আমরা কোন রকমে দোষ গোপন করিতে না পারিয়া, বাস্তবিক ঘটনাটা কি, তাহা তাঁহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই আমাদের কথায় বিশ্বাস করিলেন না। মনের সাধ মিটাইয়া আমাদিগকে চাবুকাইতে লাগিলেন। চাবুকের আঘাতে যখন আমাদের সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়া লাল হইয়া উঠিল, তখন আমাদের ছুই জনকে ছুই ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিলেন। এখানেই যে আমাদের শাস্তির শেষ হইল, তাহা নহে। দশটার পর স্কুলের ছেলেরা উপস্থিত হইলে, মাষ্টার মহাশয় আমাদের ছুই জনের মাথায় ছ'টী গাধার টুপী পরাইয়া, ক্লাসে ক্লাসে ঘুরাইয়া আনিলেন এবং ভবিষ্যতে আর কখনও কোন প্রকার দুষ্টামী করিলে, বোর্ডিং হইতে তাড়াইয়া দিবেন বলিয়া, ভয় দেখাইলেন। এইরূপে সেই দিনের গোলযোগ এক রকম থামিয়া গেল।

গোলমাল চুকিয়া গেল বটে, কিন্তু পঞ্চাননের জন্যেই আমরা ধরা পড়িলাম, সে শত্রুতা না করিলে, আমাদের এইরূপ ছুর্দ্দশা কখনই হইত না, ইত্যাদি নানা কথা আমরা

ভাবিতে লাগিলাম। সেই দিনই সন্ধ্যার পর রমানাথ ও আমি গোপনে পরামর্শ করিলাম যে, বোর্ডিং ছাড়িতে হয় তাও স্বীকার, পঞ্চাননকে একবার ভাল করিয়া শিখাইতে হইবে।

আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হইতে বড় বেশী দেরী হইল না। এই ঘটনার পর ছয় সাত দিন যাইতে না যাইতে, একদিন এক সামান্য দোষে আমরা পঞ্চাননকে বেশ করিয়া প্রহার করিলাম। হেড্‌মাষ্টার মহাশয় সেই কথা শুনিয়া, আমাদের দুই জনকে সেই দিন বিকালেই বোর্ডিং হইতে তাড়াইয়া দিলেন। ক্রমশঃ

কেনারাম।

একটি ছোট্ট ছেলে ছিল, তার নাম কেনারাম। দেখিতে সে আধ হাতের বেশী উঁচু ছিল না; কিন্তু এতটুকু লোকের পক্ষে তার খুব সাহস আর বুদ্ধি ছিল। তার মনটাও বেশ ভাল ছিল।

একদিন কেনারাম দেখিল, যে একটা ব্যাঙ্‌ ইট চাপা পড়িয়া মরিবার গতিক হইয়াছে। কেনারাম তাড়াতাড়ি একটা লাঠি দিয়া ইটের একপাশ প্রাণপণে তুলিয়া ধরিল, তাহাতেই ব্যাঙ্‌ সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে ব্যাঙ্‌ ইটের নীচে হইতে বাহিরে আসিয়াই ঠিক্ মানুষের মতন কথা কহিতে লাগিল। কেনারাম ত শুনিয়া একেবারে অবাক্! ব্যাঙ্‌ বলিল, "কেনারাম, তুমি বড় লক্ষ্মী ছেলে। তুমি বেঁচে থাক আর সুখে থাক। আমি যতদূর পারি তোমার উপকার করিব।" এই বলিয়া ব্যাঙ্‌ দু'পায় ভর করিয়া ঠিক মানুষের মতন উঠিয়া দাঁড়াইল। তার পর ক্রমে বড় হইয়া, একেবারে মেঘের সমান উঁচু হইল, তার পর কোথায় মিলাইয়া গেল, কেনারাম দেখিতে পাইল না। কেনারাম খুবই ভয় পাইয়াছিল, কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিল না। তাহার বাবা নিতান্ত গরীব ছিল। এত গরীব ছিল, যে তাকে আর তার বড় দুটি ভাইকে ভাল করিয়া খাইতে দিতে পারিত না। তাই সে একদিন বলিল—"বাবা, আমাকে বিদায় দাও, আমি নিজে করিয়া খাইব।" কেনারামের বড় ভাইরাও তাহার দেখাদেখি বলিল, যে "তাহারাও করিয়া খাইবে।"

সেই দেশের যে রাজা, তাঁহার বাড়ীর ধারে এক বটগাছ ছিল। সে গাছ ক্রমে এত বাড়িতে লাগিল, যে তাহার ডাল পালায় রাজার প্রকাণ্ড পুরী একেবারে ঢাকিয়া গেল। যত কাটে সে গাছ ততই আরো বেশী বাড়ে। একটা ডাল কাটিলে তখনই তাহার যায়গায়, তার চাইতে বড় বড় আর দুটা তিনটা ডাল বাহির হয়। বক্‌সিসের লোভে দেশ

বিদেশের কত ষণ্ডা ষণ্ডা লোক কুড়াল লইয়া, সেই গাছ কাটিতে আসিল। কিন্তু ইহাতে আরো উল্টা ফল হইল। কোথায় কমিবে, না সে গাছ আরো বাড়িয়া, শেষটা, এমন হইল, যে রাজার ঘরে আর আলো ঢুকিতে পায় না। দুপুর বেলায় আলো জ্বালিয়া রাখিতে হয়। শুধু তাহা হইলে তবুও ত রক্ষা ছিল। এর উপর আবার সে সর্ব্বনেশে গাছ মাটির সমস্ত রস টানিয়া লইল; রাজার পুকুরে আর জল নাই। ভাগ্যিস্ নারিকেল গাছে ডাব ছিল, তাই অনেক কষ্টে তৃষ্ণা নিবারণ হইতে লাগিল। রাজা খালি বলেন, "হায় হায়! কি উপায় হইবে! টাকা দিব, কড়ি দিব, অর্দ্ধেক রাজ্য দিব, সোণার পুতুল মেয়ে দিব, যে এই গাছ কাটিয়া দিবে, আর সারাবছর জল থাকে এমন কুয়া খুঁড়িয়া দিবে।"

এর পর রাত নাই দিন নাই, খালি ঠকাঠক্ কুড়ালের শব্দ, আর ঠন্ ঠন্ খন্তার শব্দ। কিন্তু সে গাছও কাটা যায় না, আর নীরেট পাথরের উপর রাজার বাড়ী, কাজেই কুয়াও খোঁড়া যায় না। কত হাজার লোক আসিয়াছিল, কি করিয়া বলিব! আর বাপ্‌রে, কি ভয়ানক

শব্দই তারা করিয়াছিল! এক মাস তোপের আওয়াজ, মেঘের ডাক পর্য্যন্ত শোনা যায় নাই, কথাবার্ত্তা ত দূরের কথা! সমস্ত কাজ কর্ম্ম ইসারার উপরে সারিতে হইত। আগে বাজ্না বাজাইয়া রাজার ঘুম ভাঙ্গান হইত। এখন, অনেক দিন ত রাজার ঘুমই হইল না। তার পর ডাক্তার ঘুমের ঔষধ দেওয়ায় ঘুম হইল বটে, কিন্তু বাজ্না শোনা যায় না, কাজেই রাজাও জাগেন না। শেষে সকলের চাইতে বুদ্ধিমান যে চাকর ছিল, সে একটা লম্বা লাঠি আনিয়া জানালার ভিতর দিয়া রাজার গায় এক খোঁচা মারিল। তাহাতে রাজা ধড়্-ফড়িয়া উঠিয়া বসিলেন। রাগে তাঁহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। তারপর তাঁহার চোখ মেলিবার আগেই, তাঁহার মুখের ভঙ্গী দেখিয়া চাকরেরা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। রাজা চোখ মেলিয়া কাহাকেও সাম্নে না পাইয়া, একেবারে সেই গাছ কাটা আর কূয়া খোঁড়ার যায়গায় আসিয়া উপস্থিত। সেখানে কাহাকে চড়, কাহাকে লাথী, কাহাকে কীল, এইরূপ করিয়া, মুহূর্ত্তের মধ্যে সব কুড়াল খন্তাওয়ালাকে তাড়াইয়া দিলেন। তখন গোলমাল থামিল, আর সকল লোকে মনে করিল, "আঃ বাঁচিলাম!"

এর পর এই নিয়ম হইল যে, কেহ গাছ কাটিতে ও কূয়া খুঁড়িতে পারিলে, রাজার কথামত পুরস্কার পাইবে বটে, কিন্তু চেষ্টা করিয়াও যদি না পারে, তবে তাহার দুটি কাণ কাটিয়া ফেলা হইবে। ইহাতে লোকের ভিড় খুবই কমিল। এখন রোজ আর তিন চারিটির বেশী আসে না। ইহারা অনেকেই রাজা রাজ্ড়ার ছেলে। এ বেচারাদের কেহই কাণ লইয়া ফিরিয়া যাইতে পারিল না।

কেনারামদের বাড়ী রাজার বাড়ী হইতে অনেক দূরে ছিল। এত দূরে থাকিয়াও তাহারা গাছ কাটিতে আর কূয়া খুঁড়িতে পারিলে, বক্সিসের কথা শুনিয়াছিল বটে, কিন্তু কাণ কাটার খবরটা তখনও তাহাদের সেখানে পৌঁছায় নাই। কেনারামদের 'করিয়া খাই-বার' কথাবার্ত্তা ঠিক এই সময়েই চলিতেছিল। কাজেই এই সংবাদ পাইয়া, তাহারা আর বিলম্ব করিতে পারিল না। তিন ভায়ে মিলিয়া রাজবাড়ীমুখী রওয়ানা হইল।

বড় ভাই গঙ্গারাম, কষ্টিরাম মেজ, কেনারাম ছোট। গঙ্গারাম খুব ষণ্ডা, খুব বোকা, আর খুব সরল। কষ্টিরামের আর গুণ কি কি ছিল, জানি না, কিন্তু এক পেট হিংসা ছিল। কেনারামের কথা ত পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কেনারামের আর এক গুণ এই ছিল, যে সে সব বিষয়েরই খবর লইতে চেষ্টা করিত। কেনারাম ছোট ছিল, দেখিতে খুব সুন্দর ছিল, আর তার স্বভাবটী বড় মিষ্টি ছিল, এই জন্যে সকলেই তাহাকে ভাল বাসিত। ভাল বাসিত না খালি কষ্টিরাম। অন্যেরা ভাল বাসিত বলিয়া সে কেনারামকে দেখিতে পারিত

না। এখন রাস্তায় বাহির হইয়া সে ক্রমাগত তাহাকে নাকাল করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিল। কেনারাম ছোট্টটি, কাজেই তত তাড়াতাড়ি চলিতে পারে না। তাই কষ্টিরামের চেষ্টা, যাহাতে তাহাকে রাস্তায় ফেলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু গঙ্গারাম তাহাকে ফেলিয়া যাইতে চাহিল না।

কতকদূর গিয়া এক বনের ভিতরে একটা ঠক্ ঠক্ শব্দ শোনা গেল। কেনারাম জিজ্ঞাসা করিল, "ও কি, দাদা ?" গঙ্গারাম বলিল, "ওটা কাঠ্ঠোক্‌রা।" কষ্টিরাম বলিল, "একবার গিয়ে দেখে আয় না।" কেনারাম অমনি দেখিতে গেল। গিয়া যাহা দেখিল, তাহা অতি আশ্চর্য্য! একখানা কুড়াল—মানুষ টানুষ কিছু নাই, খালি একখানা কুড়াল—ক্রমাগত বনের গাছ কাটিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিতেছে। কেনারামকে দেখিয়া সেই কুড়াল বলিল, "এই যে, কেনারাম! সেই ব্যাঙ্ আমাকে পাঠাইয়াছে। আমাকে সঙ্গে লও, তোমার ভাল হইবে।" কেনারাম কুড়ালখানিকে খুব যত্নের সহিত থলের ভিতরে পূরিল। তার পর ভাইদের কাছে ফিরিয়া আসিলে, তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখ্‌লি ?" কেনারাম বলিল, "ব্যাঙের কুড়াল!" এই কথা শুনিয়া গঙ্গারাম ও কষ্টিরাম হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল, আর মনে মনে স্থির করিল, "কেনাটা বড্ডই বোকা!"

আর কতক দূর গিয়া একটা ঠন্ ঠন্ শব্দ শোনা গেল। কেনারাম বলিল, "দাদা একটু দাঁড়াও না, দেখে আসি ওটা কি।" এই বলিয়া সে সেই শব্দের দিকে চলিল। খানিক দূরে গিয়া দেখিল, একটা খন্তা ক্রমাগত পাথর খুঁড়িতেছে। খন্তা কেনারামকে বলিল, "আমি ব্যাঙের খন্তা, আমাকে সঙ্গে লও।" কেনারাম খন্তাখানাকেও থলের ভিতর পূরিয়া লইল। তার পর ভাইদের কাছে ফিরিয়া যখন বলিল, "ব্যাঙের খন্তা" তখন তাহারা আরো বেশী হাসিল।

আর কতক দূর গিয়া তাহারা একটা ছোট নদী দেখিতে পাইল, তার জলে খুব স্রোত। কেনারাম জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, এত জল আসে কোথা থেকে ?" গঙ্গারাম ও কষ্টিরাম হাসিল, কিন্তু কেনারাম থামিবার ছেলে নহে। সে, কোথা হইতে জল আসে, দেখিতে চলিল। খানিক দূর গিয়া দেখিল, একটি ছোট ঝোপের ভিতরে একটা ডিমের খোলস্, তাহার মধ্য হইতে ফোয়ারার মতন হইয়া জল উঠিতেছে, আর সেই জল বহিয়া ক্রমে নদী হইয়াছে। ডিমের খোলস্ বলিল, "কেনারাম, আমাকে সঙ্গে লও, তোমার ভাল হইবে।" কেনারাম খানিকটা এঁটেল্ মাটি দিয়া খোলস্‌টির মুখ বন্ধ করিয়া, সেটাকে অতিশয় যত্নের সহিত থলের ভিতর পূরিল। ভাইদের কাছে আসিলে, তাহারা জিজ্ঞাসা করিল,

"কি দেখ্‌লি ?" কেনারাম বলিল, "ডিমের খোলস্‌ !" ইহা শুনিয়া তাহারা আরো বেশী হাসিল ; আর কেনারামকে নিতান্তই বোকা ঠাওরাইয়া, তাহাকে পেছনে ফেলিয়াই চলিল।

রাজবাড়ী অনেক দূরে থাকিতেই গঙ্গারাম ও কষ্টিরাম সেই প্রকাণ্ড বটগাছ দেখিতে পাইল ; আর তখন হইতেই তাহাদের কুড়াল দুখানি হাতে লইয়া, একেবারে কোপ উঠাইয়া চলিতে লাগিল—গাছ পাইলে অমনি এক ঘা লাগাইবে। বাস্তবিক গাছের কাছে গিয়া তাহারা এমনি কোপ মারিয়াছিল, যে এক কোপেই গঙ্গারাম একটা প্রকাণ্ড ডাল, আর কষ্টিরাম একটা প্রকাণ্ড শিকড় কাটিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, তখনই সেই ডালের যায়গায় তার চাইতে বড় বড় দুইটা ডাল গজাইল, আর সেই শিকড় হইতে একটা নূতন গাছই বাহির হইয়া পড়িল। যাই এইরূপ হইয়াছে, অমনি রাজার লোক আসিয়া তাহাদের চারিটি কাণ কাটিয়া লইল। গঙ্গারাম চ্যাঁচাইয়া কাঁদিতে লাগিল ! কিন্তু কষ্টিরাম ভাবিল, যে কেনাটা যদি টের পায়, তবে সে সাবধান হইয়া যাইবে। তাহার কাণ আর কাটা যাইবে না। তাই সে তাড়াতাড়ি নিজের কাণের রক্ত পরিষ্কার করিল এবং গঙ্গারামের রক্তও মুছিয়া দিল, আর গায়ে হাত বুলাইয়া, তাহার কান্না থামাইয়া ফেলিল।

কেনারাম আসিয়া যখন বলিল, সে গাছ কাটিবে আর কূয়া খুঁড়িবে, তখন রাজার লোকেরা হাসিয়াই কুটপাট্‌ ! কেনারাম তাহাদিগকে কিছুতেই বুঝাইতে পারিল না, যে সে বাস্তবিকই গাছ কাটিতে আর কূয়া খুঁড়িতে আসিয়াছে। যা হ'ক সে ছাড়িবার পাত্র নহে। কাণ কাটার কথা শুনিয়াও সে হটিল না বরং আরও জিদ্‌ করিতে লাগিল। শেষটা রাজাকে খবর দেওয়া হইল। রাজা আসিয়া অতটুকু মানুষের এত সাহস দেখিয়া, ভারি আশ্চর্য্য বোধ

করিলেন। কেনারাম হাত যোড় করিয়া বলিল, "দোহাই মহারাজ, ছোট দেখে অবিশ্বাস কর্‌বেন্ না! কাজ দেখে বিচার কর্‌তে আজ্ঞা হউক। না পার্‌লে, কাণ ত কাট্‌বেনই, বরং আরো শাস্তি দিবেন।"

রাজা অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কেনারাম হাত যোড় করিয়া খালি সেই এক কথাই বলে। শেষে রাজা বলিলেন, "কাণ দুটো কাটাবেই দেখ্‌ছি! আচ্ছা, তবে দেখি কি কর্‌তে পার?"

তখন কেনারাম আস্তে আস্তে সেই ব্যাঙের কুড়াল খানি বাহির করিয়া বলিল, "কুড়াল, কাট ত!" যাই এই কথা বলিয়াছে, অমনি কুড়াল ছুটিয়া গিয়া, সেই গাছের উপর পড়িল। তার পর খানিক ক্ষণ খালি একটা ভয়ানক ঠক্-ঠকা-ঠক্ শব্দ শুনা যাইতে লাগিল, আর ধুনিবার সময় যেমন তুলা উড়ে, তেমনি করিয়া গাছের ডাল পালা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। যাহারা তামাসা দেখিতে আসিয়াছিল, ডাল চাপা পড়িবার ভয়ে তাহারা চারি দিকে ছুটিয়া পলাইতে লাগিল। রাজার মস্ত ভুঁড়ি ছিল বলিয়া তেমন ছুটিতে পারিলেন না; তিনি টেবিলের নীচে গিয়া বসিয়া রহিলেন।

খানিক পরে সব চুপ চাপ হইয়া গেল। তখন দেখা গেল, যে গাছের আর কিছুই নাই, খালি একটা জ্বালানি কাঠের পাহাড় পড়িয়া আছে। কেনারামের কুড়াল গাছটাকে এমনি করিয়া কাটিয়াছে যে, এখন কেবল শুকাইয়া উনানে দিলেই হয়। কাজ শেষ হইয়া গেলে, কেনারাম কুড়াল খানিকে মুছিয়া আবার থলের ভিতরে রাখিয়া দিল।

গোলমাল থামিয়া গেলে, রাজা মহাশয় টেবিলের নীচে হইতে বাহিরে আসিয়া কেনারামকে বলিলেন, "গাছ ত কাট্‌লে, এখন কুয়া খুঁড়্‌তে পার তবে বুঝি!" কেনারাম বলিল, "মহারাজ, হুকুম হ'লেই আর কোথায় কুয়ো হবে দেখিয়ে দিলেই, আমি সে কাজটাও করতে পারি।" রাজা একটা যায়গা দেখাইয়া বলিলেন, "এইখানে কুয়ো হবে।"

এবারে কেনারাম তাহার খন্তা খানা বাহির করিয়া বলিল, "খন্তা, খোঁড় ত।" অমনি ঠন্-ঠনা-ঠন্ খন্তা খুঁড়িতে লাগিল। সে খন্তার কাছে নীরেট পাথরই কি, আর মোলায়েম মাটিই কি! দেখিতে দেখিতে একশ হাত গভীর কুয়া খোঁড়া হইয়া গেল। কেনারাম জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ, আরো চাই?" রাজা বলিলেন, "ঢের গভীর হয়েছে, কিন্তু জল কৈ?"

কেনারাম খন্তাখানা থলের ভিতরে রাখিয়া, আস্তে আস্তে ডিমের খোলস্‌টিকে বাহির করিল। তার পর রাজবাড়ীতে সকলের চাইতে সুন্দর যে মারবেল্ পাথরের ফোয়ারা

ছিল, সেইটিকে কুয়ার ধারে বসাইয়া, খোলস্‌টিকে তাহার মুখে রাখিল। তার পর খোলসের মুখের মাটি পরিষ্কার করিয়া দিতেই, হুস্ হুস্ করিয়া তাহার ভিতর হইতে অতি পরিষ্কার জল ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। তেমন পরিষ্কার জল কেহ কখনও দেখে নাই। আর এত জল! ফোয়ারা হইতে সে জল কুয়ায় গিয়া পড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে কুয়া ভরিয়া গিয়া, উঠানে জল দাঁড়াইতে লাগিল। জুতা ভিজিবার ভয়ে সকলে দৌড়িয়া গিয়া ঘরে উঠিল। রাজা মহাশয় দৌড়িতে পারেন না; যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি হাঁটিয়াই চলিলেন। সেই প্রকাণ্ড উঠান পার হইতে হইতে তাঁহার জুতা ত ভিজিয়া গেলই, কাপড়খানি দুহাতে হাঁটুর উপর তুলিয়া না রাখিলে, তাহাও ভিজিত। তখনি তিন শত কুলি লাগাইয়া খাল কাটান হইল, সেই খালের ভিতর দিয়া জল বাহির হইয়া গেল।

এখন কেনারাম রাজার মেয়েকে বিবাহ করিবে, আর অর্দ্ধেক রাজ্য পাইবে, তাহা হইলেই গল্প শেষ হয়। কিন্তু এর মধ্যে কষ্টিরাম আসিয়া গোল বাধাইল। কেনারামের সৌভাগ্য দেখিয়া, গঙ্গারাম মনের সুখে তাহার কাণের কথা ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু কষ্টিরামের তাহার উল্টা হইয়াছে। মনের দুঃখে তাহার কাণের বেদনা দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিয়াছে! সে চুপি চুপি রাজার কাছে গিয়া বলিল, "মহারাজ, যে আপনার রাজ্য পাবে, আর আপনার মেয়েকে বিয়ে কর্‌বে, আমি তার বড় ভাই। এই দেখুন, আমার দুই কাণ কাটা। আমার বড় আবার আর একজন আছে, তার যে শুধু কাণ কাটা, তা নয়। সে আবার দেখ্‌তে ভারি বিশ্রী, আর বোকা যতদূর হতে হয়! কেনাটা যদি আপনার মেয়েকে বিয়ে করে, তা হলে লোকে বল্‌বে, রাজার মেয়ের ভাসুরদের কাণ কাটা!"

রাজা বলিলেন, "তাই ত হে, তবে এখন কি উপায় ?" কষ্টিরাম বলিল, "উপায় সহজ, কাছেই একটা পাহাড়ে এক দানব থাকে। সে ত্রিশ হাত উঁচু, কেনাটাকে বলুন, সেই দানবটাকে ধরে এনে দিতে। সে কখন 'না' বল্‌তে পার্‌বে না ; আর সেখানে গেলেই দানব তার ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খাবে।" রাজা বলিলেন, "বেশ যুক্তি।"

পরদিন রাজা বলিলেন, "কেনারাম, সবই ঠিক্‌, কিন্তু ঐ দানবটাকে ধরে আন্‌তে না পার্‌লে কিছুই হচ্ছেনা। ওটাকে পেলে কাজের ঢের সুবিধে হবে।" কেনারাম বলিল, "এ আবার একটা কথা, এই আমি যাচ্ছি।"

এই বলিয়া কেনারাম কোট্‌ প্যাণ্টালুন পরিয়া সাহেব সাজিয়া, সেই দানবের বাড়ার কাছে গিয়া, চেঁচিয়া গান ধরিল। দানব দেখিতে আসিল, কে গান গায়। কিন্তু কেনারামকে অনেকক্ষণ সে দেখিতেই পাইল না। শেষে মাটির উপর শুইয়া পড়িয়া খুব মনোযোগ করিয়া দেখিল,—একটী ছোট মানুষ। তখন দানব জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কে রে ?"

কেনারাম বলিল, "আমি কেনারাম রে !"

দানব ভারি রাগিয়া গেল ; আবার অতটুকু মানুষকে ঐরূপ মুখে মুখে উত্তর দিতে দেখিলে, একটু কেমন ভয়ও হয়, তাই সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাস্‌ ?"

কেনারাম বলিল, "একটা দানব চাই দরোয়ান কর্‌বার জন্যে। মনে করেছিলাম, তোকে রাখ্‌ব ; কিন্তু তুই দেখ্‌ছি, বড় বেয়াদব।"

দানব আরো আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "তুই কি জানিস্‌ ?"

কেনারাম বলিল, "ব্যাঙের কুড়ুল কট্‌-কটাং-কাট্‌ জানি।"

দানব ভারি ভাবনায় পড়িল। সে নিজে অনেক কথা জানে, কিন্তু "ব্যাঙের কুড়ুল "কট্‌-কটাং-কাট্‌টা যে কি, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। অনেক ভাবিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "আর কি জানিস্‌ ?"

কেনারাম বলিল, "যেটা বল্লুম, তার ঠেলাই আগে সাম্‌লা দেখি।" এই বলিয়া কেনারাম

কুড়ালকে হুকুম দিল ; আর কুড়াল অমনি বনের বড় বড় গাছ কাটিয়া ফেলিতে লাগিল। দানব কিছুই জানেনা। সে দাঁড়াইয়া সবে এই কথা ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে, যে না জানি ব্যাঙের কুড়ুল কট্‌-কটাং-কাট্‌টা কি রকম দেখ্‌তে! এমন সময় ধড়াস্‌ করিয়া একটা প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছ তার মাথায় পড়িল। সেটার নীচে হইতে উঠিতে না উঠিতেই একটা আম গাছ, আর যাই আম গাছের নীচ হইতে কষ্টে স্বষ্টে বাহির হইয়াছে, অমনি একটা শিমুল গাছ কাঁটা শুদ্ধ তাহার উপরে পড়িল। দানবের মনে ভয় যা হইয়াছে, তাহা আর বলিবার নয়! সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "ও কেনারাম মশাই, থামো,—থামো! আমাকে যা বল্‌বে তাই কর্‌ব।"

কেনারামও তাহাই চায়, সুতরাং সে কুড়াল থামাইয়া বলিল, "খবরদার, যদি আর বেয়াদবি কর্‌বি, তবে তোকে একেবারে থন্তা থপ্‌-থপাং-খোঁড়্‌ দেখিয়ে দেব।"

"দানব বলিল, "ঢের হয়েছে দাদা! যা দেখিয়েছ তাতেই আমার প্রাণটা আর একটু হলেই গিয়েছিল। আমি থপ্‌-থপাং-খোঁড়্‌ আর দেখ্‌তে চাইনে।" এই বলিয়া, কেনা-রামকে কাঁধে লইয়া দানব বলিল, "কোথায় যাব বল?"

কেনারামের এখন ভারি মজা! সে দানব হাঁকাইয়া একেবারে রাজবাড়ীতে গিয়া উপস্থিত। রাজা কেনারামের হাত এড়াইয়াছেন মনে করিয়া, ভারি খুসী হইয়াছেন, কষ্টি-রামকে বখ্‌সিস্‌ দিবার জন্য তাহাকে কাছে ডাকিয়াছেন, এমন সময় হুড় মুড় করিয়া সিংহদরজাটা ভাঙ্গিয়া পড়িল। দানব ত্রিশ হাত উঁচু, আর সিংহদরজা মোটে পোনের হাত উঁচু! কাজেই সে আর কি করে, অগত্যা দরজাটা ভাঙ্গিয়াই ঢুকিয়াছে!

দানবকে দেখিয়া সকলে মনে করিল, বুঝি সে কেনারামকে খাইয়া, এখন আর সকলকে খাইতে আসিয়াছে। তাই তারা সকলে যে যে দিকে পারিল, পলাইল। পলাইতে

পারিলেন না খালি রাজা। তিনি অনেক কষ্টে একটা খুব বড় তাকিয়ার খোল খুলিয়া তাহার ভিতর ঢুকিয়া রহিলেন; মনে করিলেন, যে তাহা হইলে, দানব তাঁহাকে তাকিয়া মনে করিয়া আর খাইবে না।

এই সব কাণ্ড দেখিয়া কেনারাম ভয়ানক হাসিতে লাগিল। তাহার হাসিতে রাজার ভয় গেল বটে, কিন্তু এখন আর এক নূতন মুস্কিল ঘটিল। দানবের ভয়ে রাজার প্রকাণ্ড ভুঁড়ি অনেকটা চুপ্‌সিয়া গিয়াছিল, এখন ভয় গিয়া আবার সেই ভুঁড়ি বড় হইয়াছে। কাজেই তাকিয়ার খোল ভয়ানক আঁটা হইয়াছে, আর খোলা যায় না, কেনারাম অনেক খুঁজিয়া চাকর বাকরদের ডাকিয়া আনিলে, তাহারা আসিয়া টানাটানি করিয়া রাজাকে বাহির করিল। তখন রাজা মহাশয় হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

এর পর আর কেনারামের সম্বন্ধে কোন গোলমাল করিতে কাহারও সাহস হইল না। সুতরাং সে রাজার মেয়েকে বিবাহ করিয়া, অর্দ্ধেক রাজ্যে রাজত্ব করিতে লাগিল।

সতীশের পড়া।

মুখ বলে। রাম নামে ছিল এক ছেলে,
মন ভাবে। হরে আমার লাট্টু দেছে ফেলে!
মু। পড়া শুনায় রামের সদা মন,
ম। লাট্টু ফেলা দেখাব কেমন!
মু। প্রত্যহ রাম বিদ্যালয়ে যায়,
ম। মাঞ্জা দিব ঘুড়ির সুতায়!
মু। গুরুর কথা শুনে এক মনে,
ম। খেল্‌বো প্যাচ্ ননীলালের সনে;
মু। পরীক্ষায় সে পুরস্কার পায়,
ম। পারিনে আর বোন্‌টার জ্বালায়!
মু। রামের সাথে সবারি ভাব আছে,
ম। দুষ্টু মিটা বল্লে বাবার কাছে!

মু। মিষ্ট হাসি সদাই রামের মুখে,
ম। ওদের গাছে কুলগুলি টুক্‌টুকে!
মু। যে দেখে তায়, অমনি ভাল বাসে,
ম। পালিয়ে যাব ধর্‌তে যদি আসে।
মু। রামের গায়ে সাদাসিদে সাজ,
ম। পড়া শুনা হ'লনা ক আজ!
মু। রামের মত হও শিশু সবে,
ম। গুরুকে আজ ফাঁকি দিতে হবে!

এইরূপে সতীশের পড়া সাঙ্গ হ'ল,
এমন সুন্দর পড়া কে দেখেছ বল?
যেমন মজার পড়া, উচিত তাহার,
শিক্ষকের কাছে হ'ল বেদম্ প্রহার!
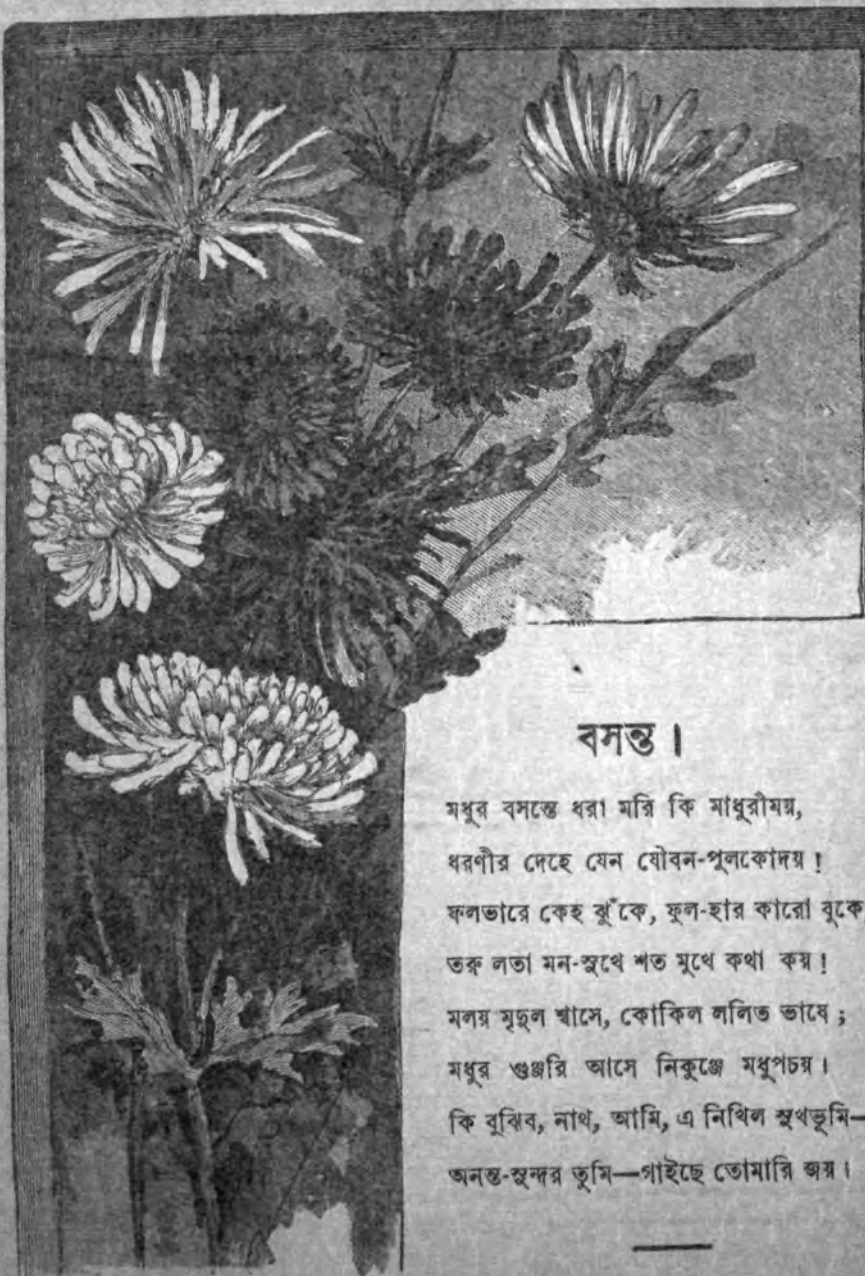
বসন্ত।

মধুর বসন্তে ধরা মরি কি মাধুরীময়,
ধরণীর দেহে যেন যৌবন-পুলকোদয়!
ফলভারে কেহ ঝুঁকে, ফুল-হার কারো বুকে,
তরু লতা মন-সুখে শত মুখে কথা কয়!
মলয় মৃদুল শ্বাসে, কোকিল ললিত ভাষে;
মধুর গুঞ্জরি আসে নিকুঞ্জে মধুপচয়।
কি বুঝিব, নাথ, আমি, এ নিখিল সুখভূমি—
অনন্ত-সুন্দর তুমি—গাইছে তোমারি জয়।
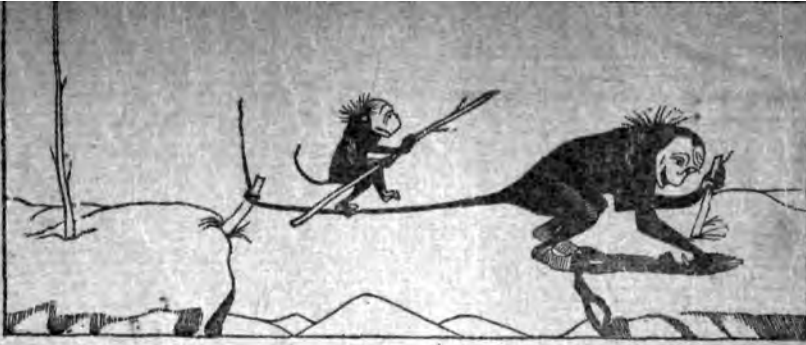
ভুতের গল্প।

আমাদের বাড়ীর পশ্চিম দিকে মস্ত একটা দীঘি। দীঘির চারি পাড়ে খুব বড় বড় অশ্বত্থ, বট, তেঁতুল এবং তাল গাছ মাথা উঁচু করিয়া রহিয়াছে। ইহার মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের তেঁতুল গাছটীর মত তত বড় গাছ আমি আর কোথাও দেখি নাই। এই গাছটা যেমন উঁচু তেমনি ঝাঁকড়া। লোকে বলে, এই গাছে হাজার হাজার ভূত বাস করে ছেলেবেলা হইতে এই সকল ভূতের গল্প শুনিতে শুনিতে, আমার মনে এমন একটা ভয় দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, এখনও, এমন কি দিনের বেলাতেও, সেই গাছটার নিকট দিয়া যাইতে হইলে শরীর শিহরিয়া উঠে, মন যেন ভয়ে কেমন করিতে থাকে! এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, ভূতগুলো কখন দলে দলে সেই গাছের উপর লাফালাফি করে, কখন মারামারি করে, আবার কখন বা পরিষ্কার কাপড় পরিয়া দীঘির দুই পাড়ের দুইটী গাছের উপর পা রাখিয়া নাচিতে থাকে। ভূতেরা অন্ধকারে থাকিতে ভাল বাসে; সেই জন্য অন্ধকার রাত্রে তেঁতুল গাছটীতে ভুতের বাজার বসে বলিলেই হয়! তবে জ্যোৎস্না রাত্রে একেবারে যে দেখা যায় না এমনও নয়। কিন্তু কালীপূজার রাত্রে তাহাদের উপদ্রব ভয়ানক বাড়িয়া উঠে। খুব সাহসী লোকেও সেই রাত্রে প্রাণ গেলেও তেঁতুল গাছটীর কাছে যাইতে চায় না। কালীপূজার দিন একবার না কি গ্রামের একটী দুষ্ট ছেলে দুপুর বেলা তেঁতুল চুরি করিতে গিয়া ভূতের হাতে মারা পড়ে!

ভূতের এত অত্যাচার সত্ত্বেও আমাদের গ্রামের একটী ছেলে ভূত আছে, ইহা কিছুতেই স্বীকার করিত না। তাহার নাম অতুল। অতুল যেমন সাহসী তেমনই বলবান। অতুল ও তাহার দুইটী বন্ধু এক বাড়ীতেই থাকিত। তাহাদের একজনের নাম গণেশ ও অপরের নাম গোপাল। গণেশ ও গোপাল সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও সত্য সত্যই যে পৃথিবীতে ভূত থাকিতে পারে, এ কথা কিছুতেই অতুলকে বুঝাইতে পারে নাই।

অতুলের সহিত এই বিষয়ে তর্ক করা বৃথা জানিয়াও, তাহারা কতবার তিন চারি ঘণ্টা ধরিয়া তর্ক করিয়াছে, কতবার বিশেষ বিশেষ প্রমাণও দিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। ভূতের অস্তিত্বে কিছুতেই অতুলের বিশ্বাস হয় নাই। একদিন এইরূপ তর্ক করিতে করিতে অতুল বলিল, "আচ্ছা, পরশু ত কালীপূজা আস্‌ছে, আমাকে যদি ভূত দেখাতে পার, আমি দশ টাকা দিব। যদি না পার, তা হ'লে কিন্তু আর কখন ভূত আছে, এ কথা বিশ্বাস করতে পারবে না।"

অতুলের কথা শুনিয়া গণেশ বলিল, "বেশ কথা, পরশু রাত্রেই তোমাকে ভূত দেখাবো! তখন মজাটা টের পাবে!" গোপাল বলিল, "কিন্তু ভাই আগে থাকতে বলে রাখ্‌ছি, যদি কোন বিপদ আপদ ঘটে আমরা তার জন্যে দায়ী হব না।"

"তোমাদের সে ভয় করতে হবে না। আমার দোনলা বন্দুকটা ও তলোয়ার খানা সঙ্গে নেব। তার পর দেখ্‌বো ভূতের কেমন সাহস! আমার কাছে কেমন সে আস্‌তে পারে! ভূত না আস্‌লে কিন্তু আমি এক ঘণ্টার বেশী সেখানে থাক্‌ব না।"

পরদিন গ্রামময় রাষ্ট্র হইল যে, রায়েদের অতুল কালীপূজার রাত্রে বারটার সময় একাকী সেই তেঁতুলতলায় যাইবে। শুনিয়া কেহ কেহ বিশ্বাস করিল না, কেহ কেহ বা অতুলকে এইরূপ কার্য্য হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু অতুল ভয়ানক একগুঁয়ে। সে যাহা করিব মনে করে, কাহারও সাধ্য নাই যে, তাহাতে বাধা দেয়। সে কিছুতেই নিরস্ত হইল না। অবশেষে কালীপূজার রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল! অতুল, গণেশ ও গোপালকে সঙ্গে লইয়া রাত আন্দাজ সাড়ে এগারটার সময় সেই তেঁতুলতলায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই স্থানটী কি ভয়ঙ্কর! একে অন্ধকার রাত, তাহাতে আবার ঘন শাখা প্রশাখার মধ্যে আকাশের নক্ষত্রগুলি পর্য্যন্ত ঢাকা পড়িয়াছিল! তখন চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ, সামান্য কোন সাড়া শব্দও ছিল না। সেই ভয়ানক সময়ে অতুল তাহার বন্ধু দুটীকে বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়া একবার ভাল করিয়া বন্দুকটী ও তলোয়ারখানি পরীক্ষা করিল; তার পর ধীরে ধীরে পায়চারি করিতে লাগিল। সে এইরূপ ভাবে অনেকক্ষণ কাটাইল; কিন্তু তথাপি ভূতের দেখা সাক্ষাৎ নাই। আরও কিছুক্ষণ গেল, তবুও ভূত আসিল না। তার পর আরও কয়েক মিনিট গত হইলে, অতুল হঠাৎ দেখিতে পাইল, তেঁতুল গাছের কয়েকটা ডাল একটু একটু নড়িতেছে। দেখিয়াই সে গাছের খুব কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং উপর দিকে চাহিয়াই দেখিতে পাইল, ধব্‌ধবে সাদা কাপড় পরিয়া কে যেন একটা ডালের উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! অন্য কেহ হইলে এই দৃশ্য দেখিবামাত্র অজ্ঞান হইয়া পড়িত,

কিন্তু অতুল ভীত হইবার ছেলে নয়, সে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "গাছের উপর কে? শীঘ্র বল, নচেৎ এখনই গুলি ছুড়িব!" অতুলের কথায় ভয় পাওয়া দূরে থাক্, বোধ হইল যেন, সেই মূর্ত্তিটা ক্রমশঃই নামিয়া আসিতেছে। তখন আর অপেক্ষা না করিয়া অতুল গুলি ছুড়িল, কিন্তু তাহাতেও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, সেই মূর্ত্তিটা ক্রমশঃ আরও খানিকটা নামিয়া আসিল। অতুল পুনরায় গুলি ছুড়িল, তথাপি কিছুই হইল না। মূর্ত্তিটা ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া, একেবারে গাছের খুব নীচের একটা ডালে আসিয়া বসিল। ক্রমান্বয়ে দুইটী গুলি ব্যর্থ হইল দেখিয়া, অতুল বিশেষ আশ্চর্য্য হইয়া গেল এবং সুতীক্ষ্ণ তলোয়ার লইয়া ছুটিয়া গিয়া, সেই শাদা কাপড়পরা মূর্ত্তিটার উপর আঘাত করিল। এ কি! কি সর্ব্বনাশ! আঘাত করিবামাত্র সেই মূর্ত্তিটা চীৎকার করিয়া নীচে পড়িয়া গেল! সেই মুহূর্ত্তে খানিকটা গরম রক্ত ঠিক্‌রাইয়া আসিয়া অতুলের হাতে মুখে লাগিল! কি সর্ব্বনাশ হইল ভাবিয়া, অতুল মুখ নীচু করিয়া দেখে, হায় হায়! সে যাহা ভয় করিয়াছিল, তাহাই ঘটিয়াছে! সে মূর্ত্তি আর কাহারও নহে, তাহার প্রিয় বন্ধু গণেশের। গণেশের অবস্থা দেখিয়া, অতুলের সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। সে তাড়াতাড়ি ক্ষত স্থান চাপিয়া রক্ত থামাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাতে কোন ফলই হইল না।

এই সময়ে গোপাল হঠাৎ যদি ডাক্তার লইয়া উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে গণেশের প্রাণরক্ষার কোন সম্ভাবনাই থাকিত না। অতুলকে তেঁতুলগাছ তলায় রাখিয়া, গণেশ ও গোপাল বাড়ীর দিকে গিয়াছিল, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু বাস্তবিক বাড়ীতে না গিয়া, তাহারা অন্য দিক দিয়া আবার সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই তাহারা লুকাইয়া, অতুলের বন্দুকে গুলির পরিবর্ত্তে কতকগুলি কাগজ ভরিয়া রাখিয়াছিল। তাই গণেশ গাছের উপরে উঠিয়া ভূত সাজিয়া কৌতুক করিতে ভয় পায় নাই। তাহারা ভাবিয়াছিল যে, ক্রমান্বয়ে দুইটী গুলির আঘাত ব্যর্থ হইতে দেখিলে, অতুল নিশ্চয়ই পলায়ন করিবে। কিন্তু অতুল যে সত্য সত্যই তলোয়ার খুলিয়া, তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে, এ কথা কেহ একবারের জন্যও মনে ভাবে নাই। সেই জন্যই আজ গণেশের এই দুর্দ্দশা!

যাহা হউক ডাক্তার যখন পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, আঘাত গভীর হইলেও সাঙ্ঘাতিক নহে, তখন অতুল ও গোপালের উৎকণ্ঠা অনেক কমিয়া গেল! তাহারা প্রাণপণ যত্নে গণেশের সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। এইরূপে প্রায় পাঁচ ছয় মাস কাল পরে, বহু কষ্ট এবং যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, গণেশ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিল।

ল্যাজে গেরো

সারাটা দিন খেটে খেটে কর্‌ছে কেমন গা,
একটু খানি না জিরুলে আর ত বাঁচি না!
—ওরে বাস্‌রে! কিসের আওয়াজ! কি যেন ঐ ডাকে—
বাঘের গায়ের গন্ধ যেন পাচ্ছি আমি নাকে!

মুখ দেখে কার উঠেছিনু, আজ সকালে ভাই,
একেবারে বাঘের মুখে পড়ে গেলাম তাই!
ভাগ্যে হেথা পিপে ছিল মোদের কপালগুণে,
তা না হ'লে ভবের লীলা ঘুচ্‌তো এতক্ষণে!

ওইরে বাবা, লাফ মেরেছে, এবার দফা সারা,
ছুই জনে আজ বাঘের পেটে গেলাম বুঝি মারা!
পিপের উপর বস্‌লো এসে, পড়্‌ল সেটা ঝুঁকে,
উল্টে যদি চাপা পড়ে তবেই আপদ চুকে!

যা ভেবেছি তাই হয়েছে, মোদের কপাল জোরে,
বন্দী হলেন ব্যাঘ্রমশাই পিপে চাপা পড়ে!
ছ্যাদা দিয়ে বেরিয়েছে ল্যাজ, ধরছি আমি তাই,
তুই আমারে শক্ত ক'রে ধরে থাকিস্ ভাই!

খুব জোরে ভাই টেনে রাখিস,
হঠাৎ গেলে ছেড়ে,
উল্টে ফেলে পিপে আবার
আস্‌বে বাঘা তেড়ে।
লোভ্‌টা যেমন তাহার উচিত
শিক্ষা দিয়া শেষে,
দুই ভায়েতে ঘরের পানে
যাব হেসে হেসে!

কেমন জব্দ, ল্যাজের আগায় বেঁধে দিছি গেরো,
পারিস্ যদি দুষ্টু বাঘা, এবার তবে বেরো!
লাফিয়ে বড় এসেছিলি মুখ্‌টা করে হাঁ,
এখন কেন ছট্‌ফটানি গোঁ-গোঁ-গোঁ-গাঁ!!!

ইতর প্রাণীর কথা

পিপীলিকা।

পিপীলিকা অতি ক্ষুদ্র প্রাণী। কিন্তু ইহাদের কোন কোন শ্রেণীর সাহস, অধ্যবসায় ও স্বজাতীয়ের প্রতি ভালবাসা প্রভৃতি দেখিলে বিস্ময়ে অবাক্ হইতে হয়। ইহারা দলে দলে

বাস করিতে ভাল বাসে। একটী দলে হাজার হাজার পিপীলিকা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই দলস্থ সকল পিপীলিকাই পরস্পরের সহিত সুপরিচিত। ইহাদের হিংসা-প্রবৃত্তিও খুব বেশী। যদি ঘটনাক্রমে কোন পি পী লি কা ভিন্ন জাতীয় পিপীলিকাদের বাসায় প্রবেশ করে, তবে তাহার আর রক্ষা নাই মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহারা তাহাকে মারিয়া ফেলে। কিন্তু স্বজাতীয় কোন পিপীলিকা বহুদিন পরে দলে ফিরিয়া আসিলেও, ইহারা বুঝিতে পারে এবং তাহাকে আদরের সহিত গ্রহণ করে।

পিপীলিকারা মাটীর নীচে তাহাদের নগর নির্ম্মাণ করে। নগরের গৃহগুলি নানা ভাগে বিভক্ত। ইহারা কোন ঘরে ডিম, কোন ঘরে ছানা, কোথাও খাদ্যাদি, কোথাও বা পীড়িত আত্মীয় স্বজনকে রাখে। প্রত্যেক পিপীলিকা-সহরে পুরুষ এবং স্ত্রী ছাড়া আর এক জাতীয় পরিশ্রমী পিপীলিকা বাস করে, তাহারা চাকর। গৃহের সকল প্রকার কাজ কর্ম্মের ভার তাহাদের উপরে থাকে। তাহারা ডিমগুলি গুছাইয়া রাখে, ছানাগুলি লালন পালন করে, ঘর দ্বার পরিষ্কার করে, এমন কি, বাসা পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইলে, নূতন বাসা ঠিক করিয়া আসে। এই শ্রেণীর পিপীলিকা না থাকিলে, তাহাদের মনিবগুলির জীবন রক্ষা হয় না। অনেক সময় তাহারা খাওয়াইয়া দিলে, তবে মনিব বাবুদের খাওয়া হয়। এই চাকরগুলি কোথা হইতে আসে, বলিতেছি। পিপীলিকা জাতি বড়ই যুদ্ধপ্রিয়। বিশেষ কোন কারণ না থাকিলেও, কেবল লুট্ করিবার জন্য ইহারা অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন দলে যুদ্ধ বাঁধাইয়া থাকে। দুই দল বলবান পিপীলিকায় যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তাহা সহজে মিটে না; ক্রমাগত চারি পাঁচ দিন ধরিয়া সেই ভয়ানক যুদ্ধ চলে। কিন্তু এক পক্ষ দুর্ব্বল হইলে, যুদ্ধ কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হইয়া যায়। কখন যুদ্ধ বাঁধে কিছুই ঠিক নাই বলিয়া, সহরের প্রত্যেক ফটকে পাহারাওয়ালা পিপীলিকা থাকে। কোন বিপদের আশঙ্কা দেখিলেই তাহারা ছুটিয়া ভিতরে গিয়া খবর দেয়, অমনি হাজার হাজার যোদ্ধা বাহিরে আসে, এবং দেখিতে দেখিতে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দেয়। যুদ্ধে যে পক্ষ পরাজিত হয়, জেতা পিপীলিকারা দলে দলে তাহাদের গৃহে প্রবেশ করিয়া, তাহাদের ডিম ও ছানাগুলি মুখে করিয়া আপনাদের গৃহে লইয়া আসে, এবং খুব যত্নে তাহাদিগকে লালন পালন করে। তাহারা বড় হইয়াই চাকর হয়। তখন সংসারের সকল ভার তাহাদের উপরেই পড়ে।

মানুষের ন্যায়, পিপীলিকারাও ভবিষ্যতের জন্য খাদ্যাদি সঞ্চয় করিয়া রাখে, ইহা হয় ত সকলেই জান। কিন্তু আমেরিকায় এক শ্রেণীর পিপীলিকা আছে, তাহারা যে অদ্ভুত উপায়ে খাদ্য সঞ্চয় করে, তাহা শুনিলে অবাক হইতে হয়। তাহারা দলের কতকগুলি পিপীলিকা বাছিয়া, কি এক আশ্চর্য্য কৌশলে তাহাদের হজমশক্তি নষ্ট করিয়া দেয়, তার পর-চারিদিক হইতে মধু সঞ্চয় করিয়া, তাহাদিগকে পান করাইতে থাকে। হজমশক্তি না থাকাতে, ক্রমে তাহাদের পেট ফুলিয়া এক একটা মধুভাণ্ড হইয়া উঠে। যখন অন্য আহার না জুটে, তখন ক্ষুধার্ত্ত পিপীলিকারা সেই মধু পান করিয়াই জীবন ধারণ করে।

এখন তোমরা পিপীলিকাদের গরুর কথা শুন। মানুষে যেমন দুগ্ধের জন্য গরু পোষে, পিপীলিকারাও তেমনি মিষ্ট রসের জন্য এক প্রকার কীট পুষিয়া থাকে। সেই কীটের পশ্চাৎ-দিকে দুইটী শুঁড় বাহির হয়। পিপীলিকারা সেই শুঁড়ে মুখ দিয়া

রস পান করিয়া থাকে। ইহারাই পিপীলিকাদের গরু। পিপীলিকারা অনেক সময় এই গরু ধরিয়া আনিয়া, গৃহে বন্ধ করিয়া রাখে; এবং প্রয়োজন মত ইহাদের রস পান করিয়া তৃপ্ত হয়।

আফ্রিকার জঙ্গলে এক জাতীয় অতি দুর্দ্দান্ত পিপীলিকা বাস করে। তাহাদের দৌরাত্ম্যের কথা শুনিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। সেই পিপীলিকারা যেমন বলশালী তেমনিই সাহসী। এক এক দলে অসংখ্য পিপীলিকা দেখিতে পাওয়া যায়। যখন সেই পিপীলিকার দল শিকার অন্বেষণে বাহির হয়, তখন জঙ্গলের ছোট বড় সকল প্রাণীই ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করে। বিখ্যাত পর্য্যটক ডুশেলু বলেন, "অনেক সময় আমি সেই পিপীলিকাদের ভয়ে গৃহ ত্যাগ করিয়া জলে আশ্রয় লইয়া জীবন বাঁচাইয়াছি। তাহারা যে গৃহে প্রবেশ করে, সেই গৃহের সমস্ত প্রাণীকে মারিয়া খাইয়া ফেলে। তেলাপোকা প্রভৃতির ত কথাই নাই, এমন কি, ছোট বড় সকল প্রকার ইদুরও তাহাদের গ্রাসে পড়িয়া কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করে। দুই এক মিনিট যাইতে না যাইতে সেই ইদুরের আর চিহ্নমাত্রও থাকে না।

"তাহারা রাত দিনই চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। যে স্থান দিয়া তাহারা যায়, সে স্থান একেবারে ঝাঁটাইয়া লইয়া যায়। শিকার অনুসরণ করিয়া তাহারা অনেক সময় উচ্চ বৃক্ষের সর্ব্বোচ্চ শাখাতে পর্য্যন্ত আরোহণ করে, এবং লাফাইয়া লাফাইয়া শিকার ধরে। বড় বড় হাতী এবং গরিলাকেও তাহাদের ভয়ে পলাইতে দেখা গিয়াছে। তাহারা দাড়া দিয়া ধরিলে আর ছাড়ান যায় না। নিগ্রোরা বলে যে, পুরাকালে কোন কোন দোষী ব্যক্তিকে নির্দ্দয়রূপে সাজা দিবার জন্য এই পিপীলিকাদের রাস্তায় ফেলিয়া রাখা হইত।"

মাকড়সা।

তোমরা সকলেই মাকড়সা দেখিয়াছ। যেরূপ অদ্ভুত কৌশলে জাল পাতিয়া ইহারা পতঙ্গাদি ধরে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। যে স্থানে এবং যেরূপে জাল পাতিলে মশা, মাছি প্রভৃতি সহজে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা, ইহারা ঠিক সেই স্থানে, তেমনি করিয়া জাল পাতিয়া, তাহার মাঝখানে আপনার বাসার মধ্যে লুকাইয়া থাকে। মশা, মাছি প্রভৃতি পড়িবামাত্র সেই জাল থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠে, আর সে অমনি ছুটিয়া আসিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলে।

ম্যাডাগাস্কার, মরিসাস্ প্রভৃতি গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে কয়েক জাতীয় বৃহৎ মাকড়সা দেখা যায়, তাহারা খুব বড় বড় জাল প্রস্তুত করে। সেই জাল কখন কখন গাছের সমুদায় ডাল পালা পর্য্যন্ত ঢাকিয়া ফেলে; এবং কখন বা নদীর এক পার হইতে অপর পার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। কোন কোন নদীর উপর মাকড়সারা এত বেশী জাল পাতে যে, সেই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য একেবারে বদলাইয়া যায়। আমেরিকার ব্রেজিল প্রভৃতি স্থানেও কয়েক জাতীয় বড় বড় মাকড়সা বাস করে। তাহারা শিকারী জন্তর ন্যায় লাফাইয়া ছোট ছোট পাখী পর্য্যন্ত ধরিয়া খায়। লঙ্কাদ্বীপে এক জাতীয় বড় মাকড়সা আছে, তাহারা যে জাল প্রস্তুত করে, সেই জালের সূতা এত দৃঢ় যে, বিশেষ সতর্ক হইয়া না চলিলে, সেই সূতার ঘর্ষণে মুখে আঁচড় পর্য্যন্ত লাগে, এবং তাহাতে মাথার টুপি আটকাইয়া ঝুলিতে থাকে। জালের মাঝখানে যে স্থানটীতে মাকড়সারা থাকে, সে স্থানটী আকারে মানুষের মাথার চাইতেও বড়। এই জালে নানাপ্রকার পতঙ্গ হইতে ছোট ছোট ইঁদুর ও সাপ পর্য্যন্তও ধরা পড়ে।

সকল শ্রেণীর মাকড়সা জাল প্রস্তুত করে না। কোন কোন মাকড়সা মাটির নীচে গর্ত্ত করিয়া অবস্থিতি করে। আপন আপন দেহের পরিমাণানুসারে তাহারা গর্ত্তটী অতি সুন্দররূপে প্রস্তুত করিয়া থাকে। ঐ গর্ত্তের ভিতর দিক রেসমী কাপড় দিয়া মুড়িলে যেমন হয়, তাহারা নিজ নিজ দেহের সূতা দিয়া সেইরূপ করিয়া মোড়ে; এবং বাক্সের ডালার
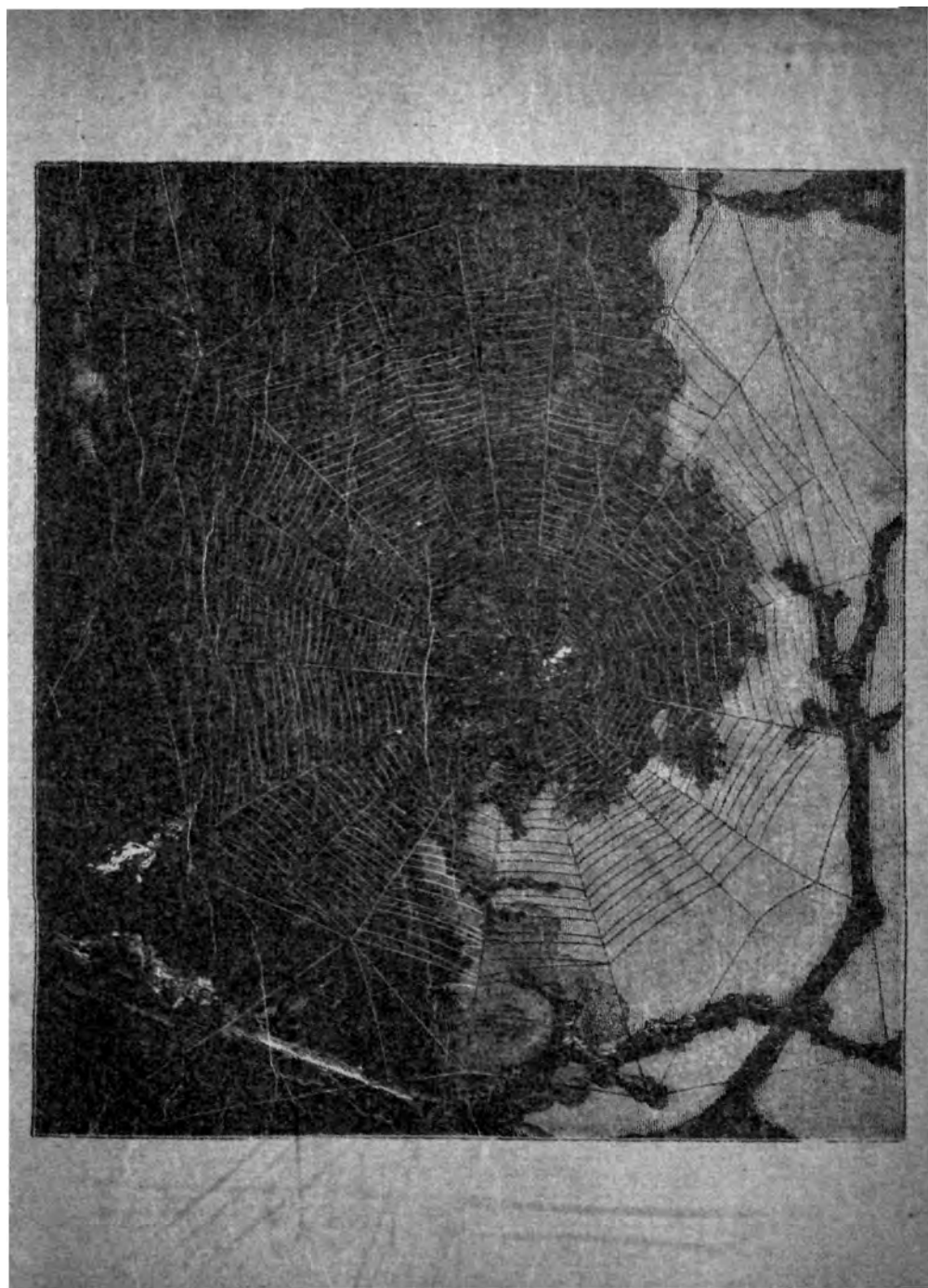
ন্যায় গর্ত্তের একটী সুন্দর আবরণ প্রস্তুত করে। তাহার একদিক সূতার কব্জার দ্বারা বদ্ধ থাকে। আবরণটী এরূপভাবে প্রস্তুত করে যে, তাহার দ্বারা গর্ত্তের মুখ বন্ধ করিলে আর একটুও ফাঁক থাকে না। চারিদিকের মাটির সহিত তাহার উপরিভাগের কোন প্রভেদ দেখা যায় না। ইহাতে শত্রুরা সহজেই প্রতারিত হয়। এই আবরণের একদিকে একটী ছিদ্র থাকে; তাহা কড়ার কার্য্য করে। সেই ছিদ্র ধরিয়া আবরণটী খোলা এবং বন্ধ করা যায়। মাকড়সা দিনের বেলা এই গর্ত্তের মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া রাত্রিকালে আহার অন্বেষণে বাহির হয়। কোন শত্রু যদি বাহির হইতে আবরণটী খুলিতে চেষ্টা করে, মাকড়সা ভিতর হইতে প্রাণপণে তাহা টানিয়া রাখে। এইরূপ কৌশলে তাহার জীবন রক্ষা হয়।

আর এক জাতীয় মাকড়সা আছে, তাহারা জলের মধ্যে কৌশলপূর্ব্বক বাসা নির্ম্মাণ করিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলচর প্রাণী শিকার করে। এখানে সেই বাসার এক-খানি চিত্র দেওয়া হইল। পাছে বাসা ভাসিয়া যায়, সেই ভয়ে মাকড়সারা সূতা দিয়া তাহা জলজ উদ্ভিদের সহিত বাঁধিয়া রাখে। কি আশ্চর্য্য কৌশলে যে তাহারা জলের মধ্যে বাস করে, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

মাকড়সার বিষ অতিশয় উগ্র। এই বিষে মশা, মাছি প্রভৃতি মুহূর্ত্ত মধ্যেই মরিয়া যায়, এবং মানুষের শরীরেও ঘা হয়। এক প্রকার বৃহৎ মাকড়সা আছে, তাহাদের বিষ আরও ভয়ঙ্কর। তাহাদের দংশনে মানুষের জ্বর হয়, এবং সে ভয়ানক যন্ত্রণা অনুভব করে। সময়ে সময়ে সেই যন্ত্রণাতেই তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। শুনিতে পাওয়া যায়, ইউরোপের অন্তর্গত ইটালীর কোন কোন স্থানে একপ্রকার বড় মাকড়সা আছে, তাহারা কাহাকেও দংশন করিলে, সেই ব্যক্তির নাচ দেখা এবং গান শুনা রোগ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে! ইহা ভিন্ন আর কিছুতেই তাহার যন্ত্রণার উপশম হয় না। কিন্তু এই ঘটনা কতদূর সত্য, তাহা বলা যায় না।

মা লক্ষ্মী।

কার পানে, মা, চেয়ে আছ, মেলে দুটি করুণ আঁখি!
কে ছিঁড়েছে ফুলের পাতা, কে ধরেছে বনের পাখী!
কে কারে কি বলেছে গো, কার প্রাণে বেজেছে ব্যথা,
করুণায় যে ভ'রে এল দুখানি তোর আঁখির পাতা!
খেল্‌তে খেল্‌তে মায়ের আমার আর বুঝি হ'ল না খেলা!
ফুলের গুচ্ছ কোলে পড়ে কেন মা এ হেলাফেলা।

অনেক দুঃখ আছে হেথায়, এ জগৎ যে দুঃখে ভরা,
তোমার দুটি আঁখির সুধায় জুড়িয়ে গেল নিখিল ধরা!
লক্ষ্মী আমার বল্ দেখি মা, লুকিয়ে ছিলি কোন্ সাগরে!
সহসা আজ কাহার পুণ্যে উদয় হ'লি মোদের ঘরে!
সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলি হৃদয়-ভরা স্নেহের সুধা,
হৃদয় ঢেলে মিটিয়ে যাবি এ জগতের প্রেমের ক্ষুধা!
থামো, থামো, ওর কাছেতে কয়োনা কেউ কঠোর কথা,
করুণ আঁখির বালাই নিয়ে কেউ কারে দিও না ব্যথা!
সইতে যদি না পারে ও, কেঁদে যদি চলে যায়—
এ ধরণীর পাষাণ প্রাণে ফুলের মত ঝরে যায়!
ও যে আমার শিশির কণা, ও যে আমার সাঁজের তারা।
কবে এল, কবে যাবে, এই ভয়েতে হইরে সারা!

১। বাঃ কি মজা। নীচের এই ছবিখানি যেন সজীব! একটু নাড়িলেই ঘুরিতে আরম্ভ করে! এ কি!
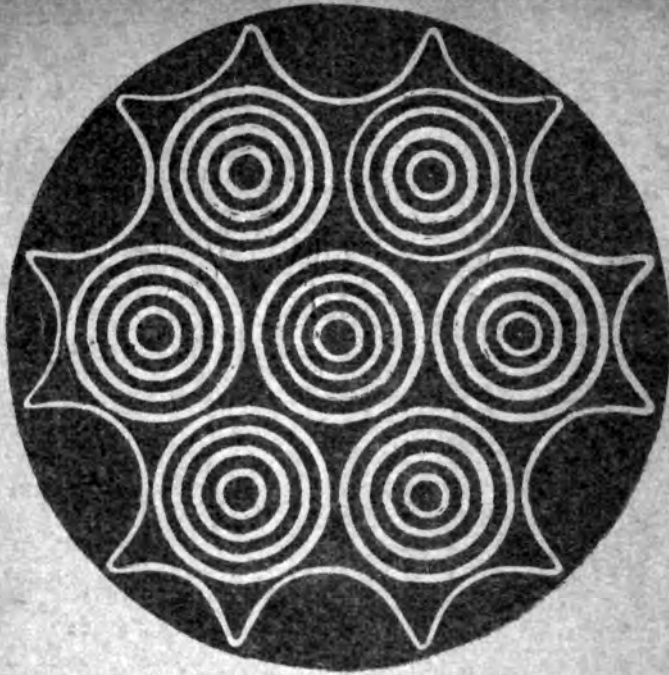
২। ১ ২, ২ ৩, ৩ ৪, ৪ ৫, ৫ ১, এই লাইন গুলি বাঁকা না সোজা, বল দেখি? কি বল্লে, বাঁকা? কখনই না, সোজা। বইখানি উঁচু করিয়া এক পাশ দিয়া দেখিলে সহজেই তাহা বুঝিতে পারিবে।
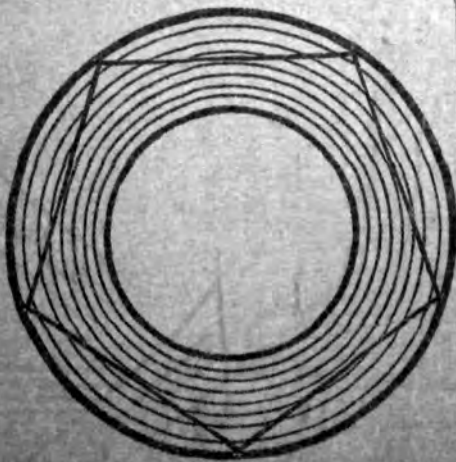
৪। পাশের কাগজখানি চারিভাগে বিভক্ত কর। প্রত্যেক ভাগ যেন ঠিক সমান হয়।

৫। পাশের ছবি খানিতে কয়েকটী লাইন এবং কয়েকটী বিন্দু যোগ করিলে, তিনটী মাছের মত দেখাইবে। কোথায় কোথায় লাইন টানিতে এবং বিন্দু বসাইতে হইবে, বল দেখি?

৬। নীচের "গোলক ধাঁধাটীর" মাঝখানে এক ইঁদুর এবং একপাশে একটী বিড়াল বসিয়া রহিয়াছে; বিড়াল কোন্ পথ দিয়া যাইলে, ইঁদুর ধরিতে পারিবে, বল দেখি? কিন্তু মনে থাকে যেন, বিড়ালকে ঠিক রাস্তা দিয়া যাইতে হইবে; সে একটীও বেড়া ডিঙ্গাইতে পারিবে না।

৭। এক ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার বড় ছেলেকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার আস্তাবলে যে ঘোড়া-গুলি আছে, তাহার অর্দ্ধেকগুলি তুমি লইও, তৃতীয়াংশ তোমার মেজ ভাইকে দিও এবং নবমাংশ তোমার ছোট ভাইকে দিও। তাঁহার মৃত্যুর পর দেখা গেল, মোটে ১৭টী ঘোড়া আছে। বল দেখি, ঘোড়াগুলি কিরূপে ভাগ করিতে হইবে?

৮। ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ০ এই রাশিগুলিকে এমন দুইটী পৃথক ভগ্নাংশে পরিণত কর, যাহার যোগফল ১। কিন্তু কোন রাশি এক বারের অধিক ব্যবহার করিতে পারিবে না।

৯। নীচে যে বৃত্তগুলি রহিয়াছে, তাহার যে কোন একটী হইতে আরম্ভ করিয়া, ১, ২, ৩, ৪, গণিয়া ৪র্থটীতে দাগ দাও। আবার কোন একটী বৃত্ত হইতে ১, ২, ইত্যাদি গণিয়া ৪র্থটীতে দাগ দাও। এইরূপ করিয়া একটী বৃত্ত বাদে আর সকলগুলিতেই দাগ দিতে হইবে। কিন্তু কোন দাগ দেওয়া বৃত্ত হইতে গণনা আরম্ভ করিতে পারিবে না। তবে তাহা গণনার মাঝে ধরিতে কোন বাধা নাই।
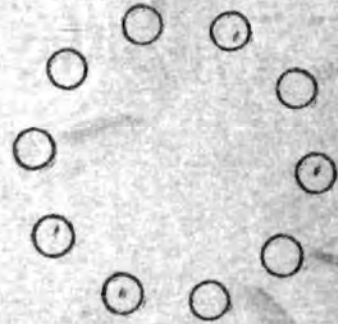
১০। এক বাবু ৪৫টী লিচুগাছ আনিয়া, মালীকে সেগুলি ৯য় লাইনে, ৫টী করিয়া বসাইয়া দিতে বলিলেন। মালী তাহা হইতে ২৬টী গাছ চুরি করিয়া বাকী ১৯টী ৯য় লাইনে, (প্রত্যেক লাইনে ঠিক ৫টী করিয়া) বসাইয়া দিল। বল দেখি, যে কিরূপে গাছগুলি বসাইয়াছিল?

১১। এক চিড়িয়াখানায় ২৬টী মাথা ও ১০০ খানি পা ছিল। বল দেখি, তাহার মধ্যে কতগুলি পাখী, আর কতগুলি পশু?

বেলুন

১৭৮২ সালে নভেম্বর মাসে ফরাসী দেশে প্রথম বেলুন আবিষ্কৃত হয়। জোসেফ্ মোগল-ফিয়ে ও ষ্টিভেন্ মোগলফিয়ে নামে দুই ভাই প্রথমে বেলুন উড়াইতে শিখেন। আগুনের ধোঁয়া আপনা আপনি উর্দ্ধে উঠে দেখিয়া, তাঁহারা ভাবিলেন যে, কতকটা ধোঁয়া একটা হাল্কা থলের মধ্যে পুরিয়া ছাড়িয়া দিলে, সেই থলেটাও নিশ্চয়ই উপরে উঠিবে। এই ভাবিয়া, তাঁহারা কাগজের একটা মস্ত থলে প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে ধোঁয়া পূরিয়া ছাড়িয়া দিলেন। অমনি দেখিতে দেখিতে সেই থলেটা প্রায় চল্লিশ হাত উচ্চে উঠিয়া, কিছুক্ষণ স্থিরভাবে রহিল। তাহার পর ধোঁয়া শীতল হইয়া আসিলে, আবার ধীরে ধীরে নামিয়া পড়িল।

প্রথম চেষ্টাতেই কৃতকার্য্য হইয়া তাঁহারা দুই ভাই উৎসাহে একেবারে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন, এবং নানা প্রকারে বেলুনের উন্নতির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার পর মস্ত একটা কাপড়ের বেলুন প্রস্তুত করিয়া, তাঁহারা ১৭৮৩ সালের ৫ই জুন, বহুসংখ্যক দর্শকের
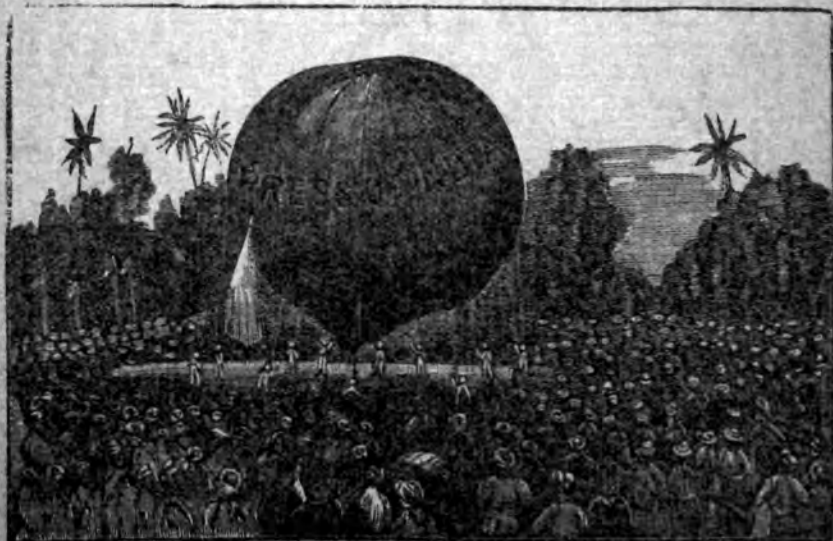
সম্মুখে শূন্যে তুলিলেন। সেই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রমে তাহাদের দুই ভাইয়ের প্রশংসায় চারিদিক ভরিয়া গেল। সেই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহারা আরও একটা বড় বেলুন প্রস্তুত করিয়া শূন্যে উড়াইলেন। সেই

বেলুনে একটী হাঁস, একটী মোরগ, ও একটী ভেড়া ছিল। প্রায় দেড় হাজার ফীট্ উচ্চে উঠিয়া বেলুন আবার ধীরে ধীরে নামিয়া আসিল। জীবন্ত প্রাণীর মধ্যে এই হাঁস, মোরগ এবং ভেড়াই প্রথম বেলুনে আরোহণ করে। সেই বৎসর ২১এ নভেম্বর রোজিয়ার নামে এক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত, ও অপর এক ব্যক্তি, বেলুনে আরোহণ করিয়া সকলকে চমকিত করিলেন! ইহার পূর্ব্বে আর কোন ব্যক্তিই বেলুনে উঠেন নাই।

এই ঘটনার পর ইউরোপের নানা স্থানে বেলুন লইয়া মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল; এবং যাহাতে বেলুনের নানা প্রকার উন্নতি হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতে লাগিল। ক্রমে প্যারাস্থুট্ প্রভৃতিও আবিষ্কৃত হইল; এবং অনেক সাহসী লোকে বেলুনে চড়িয়া ও প্যারাস্থুটের সাহায্যে নিম্নে অবতরণ করিয়া সকলকে বিস্মিত করিতে লাগিলেন।

স্থানাভাবে সে সকল কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ না করিয়া, আজ তোমাদিগকে আমাদের স্বদেশী, বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেলুনে উঠা, এবং প্যারাস্থুটের সাহায্যে নামিয়া আসার বিষয়ে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই কিছু বলিব। রামবাবুর পূর্ব্বে আর কোন বাঙ্গালী

বেলুনে উঠিতে সাহস করেন নাই। সুতরাং, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, এক দিন রামবাবু বেলুনে উঠিবেন শুনিয়া, আমরা কয়েক জনে মিলিয়া দেখিতে গেলাম। যে স্থান হইতে তাঁহার বেলুনে উঠিবার কথা ছিল, নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রায় চারি পাঁচ ঘণ্টা পূর্ব্বে সে স্থান লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছিল। আমরা সেই ভিড়ের ভিতর হইতে কোন রকমে মাথা উঁচু করিয়া দেখিলাম, রবারের বাঁশী ফুঁ দিয়া ফুলাইলে যেমন হয়, প্রকাণ্ড একটী গম্বুজের ন্যায় সেইরূপ পদার্থ, মাতালের মত একবার দক্ষিণে, একবার বামে টলিতেছে, আর কতকগুলি লোকে দড়ি ধরিয়া তাহা টানিয়া রহিয়াছে। সেটা মস্ত

একটা বেলুন। বেলুনটা ক্রমে ক্রমে ফুলিয়া গোলাকার ধারণ করিল। অল্পক্ষণ

পরেই দেখিলাম, রামবাবুকে লইয়া সেই বেলুন শূন্যে লাফাইয়া উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে একেবারে মেঘের কাছে উপস্থিত হইল। আমরা সকলে অবাক্ হইয়া উর্দ্ধে চাহিয়া রহিলাম। অত বড় বেলুনটা দেখিতে দেখিতে একটা বলের আকার ধারণ করিল। তাহার পর বেলুন একখানা মেঘের মধ্যে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়, রামবাবু প্যারাস্থটের দড়ি ধরিয়া লাফাইয়া পড়িলেন। পড়িবামাত্র, আমরা যে ভয়ানক দৃশ্য দেখিলাম, তাহাতে ভয়ে আমাদের আপাদ মস্তক কাঁপিতে লাগিল। কয়েক শত ফিট্ পর্য্যন্ত, একবার রামবাবু উপরে প্যারাস্থট্ নীচে, আবার প্যারাস্থট্ উপরে রামবাবু নীচে, এই ভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে নামিয়া, সহসা প্যারাস্থট্‌টা খুলিয়া গেল। তখন আমাদের মনে আর কোন উৎকণ্ঠা রহিল না। রামবাবু ধীরে ধীরে নামিয়া আসিলেন। একজন বাঙ্গালীর এরূপ বীরত্ব দেখিয়া, উপস্থিত সকলেই, এমন কি,সাহেবেরা পর্য্যন্ত ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

এখন তোমাদিগকে, বেলুন আবিষ্কার হইবার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত যে দুই ব্যক্তি বেলুনে চড়িয়া, সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চে

আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের বিষয়ে কিছু বলিব। তাঁহারা ভূমি হইতে সাত মাইল উচ্চে উঠিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত আর কোন ব্যক্তি এত উচ্চে উঠিতে পারেন নাই। তাঁহাদের একজনের নাম কক্সওয়েল, অপরের নাম গ্লেসার। ১৮৬২ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডের অন্তর্গত "ওল্ভারহ্যামটন্" নামক স্থান হইতে প্রকাণ্ড একটী বেলুনে চড়িয়া তাঁহারা দুই জনে শূন্যে যাত্রা করেন। এ বিষয়ে গ্লেসারের লিখিত একটী বৃত্তান্ত হইতে নিম্নে কিছু অনুবাদ করিয়া দিলাম। "দুপুর ১টা ৩ মিনিটের সময় আমরা পৃথিবী ত্যাগ করিয়া শূন্যে যাত্রা করি। আমরা পাঁচ হাজার ফীটেরও উচ্চে উঠিয়া ১টা ১৩ মিনিটের সময় প্রকাণ্ড এক খানা মেঘের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। মেঘখানি প্রায় এক হাজার ফিট্ গভীর ছিল। কিন্তু আমরা কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেই গাঢ় মেঘরাশি অতিক্রম করিয়া, আবার মেঘশূন্য অনন্ত নীলাকাশে গিয়া পড়িলাম; প্রখর সূর্য্যের কিরণ আমাদের সর্ব্বাঙ্গ উত্তপ্ত করিতে লাগিল! তখন নিম্নের দৃশ্য অতি সুন্দর দেখাইতে ছিল। ঘন মেঘরাশি, কোথাও পর্ব্বতমালা, কোথাও তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গ, কোথাও বা সমতল উপত্যকার আকার ধারণ করিয়া, প্রকৃতির এক অভিনব সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতেছিল! সেই সৌন্দর্য্য দেখিয়া একখানি ফটো তুলিবার আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু বেলুন এত তাড়াতাড়ি উঠিতেছিল, যে কোন প্রকারে ফটো তুলিবার সুযোগ পাই নাই। ১টা ২২ মিনিটের সময় আমরা দুই মাইল উচ্চে উঠিলাম। আকাশ ক্রমশঃই গাঢ় নীল। সেই স্থান হইতে, মেঘের ফাঁক দিয়া পৃথিবীর শোভা অতি মনোহর দেখাইতে লাগিল। তাহার পর আর ছয় মিনিটের মধ্যে আমরা আরও এক মাইল উচ্চে উঠিলাম। ইহার কয়েক মিনিট পরেই মিষ্টার কক্সওয়েল নিঃশ্বাস লইতে কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন। ১টা ৪০ মিনিটের সময় আমরা চারি মাইল উচ্চে উঠিলাম। তাহার পর বেলুন হইতে কিছু বালি ফেলিয়া দেওয়াতে, আমরা আর দশ মিনিটে, পাঁচ মাইল উচ্চে উঠিলাম। এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে চারিদিকের শোভা দেখিতে ছিলাম; নিঃশ্বাস লইতে কোন প্রকার কষ্ট অনুভব করি নাই। কিন্তু এখন হইতে আমার নিঃশ্বাস লওয়া কষ্টকর হইয়া উঠিল, এবং আমার দৃষ্টিশক্তিও কমিয়া আসিতে লাগিল। কয়েক সেকেণ্ড যাইতে না যাইতে আমার চক্ষে এমন তেজও রহিল না যে, ঘড়ির কাঁটা পর্য্যন্ত দেখিতে পাই। চারিদিক্ অন্ধকার বোধ হইতে লাগিল।

"বেলুন অনবরত ঘুরিতে ঘুরিতে উঠিতেছিল বলিয়া, যে দড়ি টানিয়া বেলুনের গ্যাস বাহির করিয়া দিতে হয়, সেই দড়ি জড়াইয়া গিয়াছিল। মিষ্টার কক্সওয়েল কড়া বাহিয়া

সেই দড়ি ছাড়াইয়া দিতে উঠিলেন। তখন আমরা ২৯০০০ ফীটেরও অনেক উচ্চে উঠিয়াছি। ইহার অল্পক্ষণ পরেই আমি টেবিলের উপর হাত রাখিয়া, আবার তুলিতে যাইয়া দেখি, আমার ডান হাত একেবারে অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। বাঁ হাত নাড়িতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই নাড়িতে পারিলাম না। তাহার পর আমার সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবশ হইয়া পড়িল, ঘাড় বাঁকিয়া বাম স্কন্ধের উপর লুটাইয়া পড়িল। অনেক কষ্টে মাথা সোজা করিতে চেষ্টা করিলাম, মুহূর্ত্তের জন্য মাথা সোজা হইয়া, তখনই আবার দক্ষিণ স্কন্ধের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল! অবশেষে আর আমি বসিয়া থাকিতে পারিলাম না, ঝুড়ির পাশে হেলিয়া পড়িলাম। বেলুন তখনও উপরে উঠিতেছিল। আমি সেই সীমাহীন, শব্দহীন, অনন্ত নীলাকাশে অর্দ্ধ জাগ্রত এবং অর্দ্ধ অচেতন অবস্থায় কিছুক্ষণ কাটাইয়া, শেষে একেবারে অচেতন হইয়া পড়িলাম। কয়েক মিনিট এই ভাবেই কাটিল। তৎপরে অল্প অল্প চেতনা হইলে দেখিলাম, মিষ্টার কক্সওয়েল নানাপ্রকারে আমার চেতনা সম্পাদনে যত্ন এবং চেষ্টা করিতেছেন।

"বেলুন ৩৭০০০ হাজার ফীট্ উচ্চে উঠিবার পর, গ্যাস বাহির হইয়া যাইলে, আবার নামিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে আমার একটু একটু চেতনা হইল। আমি উঠিয়া বসিলাম, এবং হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে লোকে যেমন কেমন এক রকম হইয়া যায়, আমার অবস্থাও ঠিক সেই রকম হইল। আমি শীঘ্রই আবার হাতে পায়ে জোর পাইলাম। আমার দৃষ্টিশক্তিও ফিরিয়া আসিল। ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম, আমি মোটে সাত মিনিটকাল অজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম। তাহার পর চাহিয়া দেখিলাম, বেলুনের যেখানে যে জলটুকু ছিল, সব জমিয়া বরফ হইয়া গিয়াছে। শেষে নামিতে নামিতে, আমাদের বেলুন আড়াইটার কিছু পরে একেবারে ভূমিতে আসিয়া পড়িল।"

বেলুনবাজ নাবিকের গল্প *

বিলাতে কোন বড় জাহাজে,একজন নাবিক মদ খাইয়া মাতলামি করায়,সেই জাহাজের কাপ্তেন তাহাকে আচ্ছা করিয়া চাবুকাইয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে লোকটার বড় রাগ হয়। সে নাবিকের ব্যবসা ত্যাগ করিয়া একটা বেলুন কিনিয়া, বেলুনবাজের ব্যবসা আরম্ভ করিল এবং সহরে সহরে সেই বেলুনে উঠিয়া, বেশ দুপয়সা রোজগার করিতে লাগিল; কিন্তু কাপ্তেনের উপর তাহার রাগ কিছুতেই গেল না।

* এই গল্পটী আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের লিখিত।

যে গ্রামে তাহার বাড়ী, সেই গ্রামের কাছে একটা বন্দরে একবার জাহাজ লাগিলে, কাপ্তেন নামিয়া তাঁহার এক বন্ধুর সহিত দেখা করিতে যাইতেছিলেন ; সে লোকটা আগেই এ সন্ধান পাইয়াছিল। গ্রামের পর একটা মাঠ পার হইয়া কাপ্তেনের বন্ধুর বাড়ী যাইতে হয়। কাপ্তেন যখন সেই মাঠ পার হইতেছেন, তখন সেই লোকটা জন কয়েক সঙ্গী লইয়া আসিয়া কাপ্তেনকে বাঁধিয়া ফেলিল এবং যাহাতে তিনি চেঁচাইতে না পারেন, সেই জন্য তাঁহার মুখে কাপড় চাপা দিয়া ধরিল।

তাহারা পূর্ব্বেই একটা বেলুন উড়াইয়া, দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। কাপ্তেনকে ধরিয়া আনিয়া সেই বেলুনের দড়ি কাপ্তেনের কোমরবন্ধে বাঁধিয়া দিল। দিয়া বলিল, "কেমন কাপ্তেন, আর কোন নাবিককে চাবুক মারিবে ?" কাপ্তেনের বড় রাগ হইল, তিনি বলিলেন, "কি বলিব, আমি একা, আর তোমরা দশজন, নহিলে তোমাকে আবার চাব্‌কাইতাম।" কাপ্তেনের কথা শুনিয়া বেলুনবাজ বলিল, "এখনও এত তেজ ? আচ্ছা, তোমার চাবুক মারা রোগ সারিয়ে দিচ্ছি !" এই বলিয়া সে বেলুনের দড়ি খুলিয়া দিল। নিকটে পাইয়া কাপ্তেন অমনি বেলুনবাজের এক হাত ধরিয়া ফেলিলেন। তিনি ভাবিলেন, তাহাকে ধরিলে, তাহার সঙ্গীরা বেলুন নামাইবে। কিন্তু দুষ্কর্ম্মের সঙ্গীরা প্রায়ই বিপদের সময় সাহায্য করে না। তাহারা দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল। কাপ্তেন ও বেলুনবাজকে লইয়া বেলুন সাঁ সাঁ করিয়া উপরে উঠিল। তখন কাপ্তেন দেখিলেন, সর্ব্বনাশ ! এমন করিয়া তিনি একটা লোককে কতক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারিবেন ? তিনি বলিলেন, "তাই ত ! এরূপে আমি কতক্ষণ তোমাকে রাখিতে পারিব ?" বেলুনবাজ বলিল, "আমার পকেটে একটা ছোট বন্দুক আছে। আমি বেলুন লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়ি, গুলি লাগিয়া বেলুনে ফুটা হইলে, গ্যাস বাহির হইয়া যাইবে, বেলুনও নামিবে।" এই বলিয়া সে এক হাতে পকেট হইতে বন্দুকটা বাহির করিয়া ছুড়িল ; কিন্তু সেই সময় একটা দম্‌কা বাতাস আসিয়া বেলুনটাকে এক পাশে হেলাইয়া দিল, বন্দুকের গুলি বেলুনে লাগিল না। দেখিয়া কাপ্তেনের মাথা ঘুরিয়া গল।

তিনি বেলুনবাজকে বলিলেন—"আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম; কিন্তু তোমাকে বাঁচাই কেমন করিয়া ?"

মাথায় রক্ত উঠিয়াছিল বলিয়া, কাপ্তেন ক্রমে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শরীর অবশ হইয়া আসিল; তিনি দুই হাতে বেলুনবাজের এক হাত ধরিয়াছিলেন। তাঁহার হাত অবশ হওয়ায়, তাহাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। বেলুনবাজ শূন্য হইতে পড়িয়া গুঁড়া হইয়া গেল!

কাপ্তেন অজ্ঞান অবস্থায় রহিলেন—বেলুন উপরে উঠিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে কাপ্তেনের চেতনা হইলে তিনি দেখিলেন, তাঁহার নাক দিয়া রক্ত বাহির হইতেছে। যে রক্ত মাথায় উঠিয়াছিল তাহা বাহির হওয়ায়, তিনি একটু শান্তি বোধ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি বহু কষ্টে দড়ি বাহিয়া উঠিয়া ছুরী দিয়া বেলুনে একটা ছিদ্র করিয়া দিলেন। দুলিতে দুলিতে ধীরে ধীরে বেলুন নামিতে লাগিল, শেষে সমুদ্রের তীরে আসিয়া পড়িল। কাছেই এক জেলের কুটীর ছিল, কাপ্তেন সেখানে গিয়া আশ্রয় লইলেন। তাহার পর বহু কষ্টে দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

যমজ-ভাই।

আকারে প্রকারে রামু ও শ্যামুতে
কিছুই প্রভেদ নাই,
গরীবের ঘরে জনমিয়াছিল
দুইটী যমজ ভাই।
যেমন তাদের গড়ন পেটন
তেমনি মতি গতি,
তা'দিগে লইয়া আত্মীয় স্বজন
মুস্কিলে পড়িত অতি।
অতি ছোট যবে ছিল রামু শ্যামু
না উঠিতে কচি দাঁত,
একে একে একে ক্রমে হ'ল শত
বিপদের সূত্রপাত।

ক্ষুধার জ্বালায় কেঁদে কেঁদে রামু
যখন পড়িত টলে,
জননী আসিয়া দিতেন আহার
শ্যামুরে লইয়া কোলে!
আবার যখন কফ্ ভরা নাকে
রামু সে কাঁদিত ব'সে,
শ্যামুর নাসিকা ধরিয়া জননী
ঝাড়িয়া দিতেন ক'সে!
ক্রমে যবে এল ভাতের সময়
নূতন কাপড় প'রে,
দুই ভাই তারা একেবারে গেল
মিশে ঘুশে চির তরে!

ঠিক ছিল যার শ্যামু নাম হবে
নাম হ'ল তার রামু,
কাজেই সকলে অন্য ভাইটীরে
ডাকিত বলিয়া শ্যামু।
তার পর যবে ইস্কুলে গেল
তাহারা দুইটী ভাই,
কত যে বিপদ সাথে নিয়ে গেল
সংখ্যা তাহার নাই!
রামুর যে দিন হইত না পড়া,
বেত গাছি হাতে ধ'রে,
পণ্ডিত মশাই, শ্যামুর পিঠেতে
কসিয়ে দিতেন জোরে!
এর প্রতিফল রামুকে স্বরায়
হইত আবার পেতে,
শ্যামুর অসুখে তাহাকে হইত
তিক্ত ঔষধ খেতে!

ইস্কুল ছাড়িয়া গেল দুটী ভাই
ব্যবসা বাণিজ্য আশে,
দুইটী দোকান খুলিয়া বসিল
সহরের এক পাশে।
দু'জনারি এক সর্ব্বনেশে ছাঁদ
যতই নষ্টের মূল,—
সহরের লোকে পড়িয়া বিপাকে
করিতে লাগিল ভুল!
রামুর জিনিস কিনিয়া তাহারা
শ্যামুকে দিইত দাম,
শ্যামুর জিনিস সুলভ হইলে
রামুর হইত নাম!
একদিন শ্যামু কি জানি কি দোষে
চাকরে মারিল ধ'রে,
বিচারে রামুর মেয়াদ হইল
ছয়টী মাসের তরে!

সারাটী জীবন রামু আর শ্যামু
ভুঞ্জিয়া অশেষ ক্লেশ,
বুড়া হ'ল ক্রমে; তবুও তাদের
বিপদের নাহি শেষ!
একদিন রামু সাপের কামড়ে
মরিল পড়িয়া মাঠে,
আত্মীয় স্বজন শ্যামুরে লইয়া
পোড়ায়ে আসিল ঘাটে!

পরাজয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বোর্ডিং হইতে বাহির হইয়া, আমি ও রমানাথ একটা চেনা মুদীর দোকানে আমাদের জিনিসপত্র রাখিয়া, গড়ের মাঠে বেড়াইতে গেলাম। রাগে দুঃখে ও অপমানে তখন আমাদের উভয়ের মন এত উত্তেজিত ছিল যে, ভবিষ্যতে কি করিব, কোথায় যাইব, ইত্যাদি কোন কথাই আমাদের মনে আসিল না। গড়ের মাঠের নির্ম্মল বায়ু সেবনে শরীর ও মন কতকটা শীতল হইলে, একটী বটগাছের তলায় বসিয়া, আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ কার্য্য কলাপের বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলাম। রমানাথ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি বাড়ী গিয়া তোমার মাকে এ সব কথা বল্‌বে না কি?" রমানাথের প্রশ্ন শুনিয়া হঠাৎ মার কথা আমার মনে হইল। মায়ের সেই মলিন মুখ, সেই বেদনাব্যঞ্জক চক্ষের জল, সেই স্নেহ ভরা আদর, সেই সুমধুর উপদেশ, একে একে সকল কথাই আমার মনে পড়িতে লাগিল। আমি যাতনায় কাতর হইয়া রমানাথকে বলিলাম, "ভাই কোন্ মুখে আর মায়ের কাছে যাব! মা একথা শুন্‌লে বিষ খেয়ে মর্‌বেন। আমি কোন রকমেই মার কাছে যেতে পার্‌ব না।"

"আচ্ছা, তবে চল বরিশালে আমার কাকার কাছে যাই; সেখানে কিছু দিন থেকে তোমার যেখানে ইচ্ছা হয় পরে যাবে।"

আমার কাছে টাকা কড়ি যাহা ছিল, তাহাতে কলিকাতায় পাঁচ ছয় মাস বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে কাটাইতে পারিতাম। কিন্তু কলিকাতায় থাকিতে আমার ইচ্ছা ছিল না, এবং বাড়ীতে যাইতেও সাহস হইল না। সুতরাং রমানাথের সহিত বরিশালে যাওয়াই স্থির করিয়া, আমরা রাত আন্দাজ দশটার সময় সেই মুদীর দোকানে ফিরিয়া আসিলাম। তার পর কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া দুই জনে সেই খানেই শয়ন করিলাম। কিছুক্ষণ পরে, আমার একটু একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, এমন সময় রমানাথ আমার গা ঠেলিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "তোমার কাছে কত টাকা আছে? সাবধানে রেখেছ ত?"

"আমার কাছে নোটে ও টাকায় মিলাইয়া দেড়শত টাকা আছে। সে টাকা আমার কোটের পকেটে একটী মনিব্যাগের ভিতরে রেখেছি," এই বলিতে বলিতে আমি পাশ ফিরিয়া শুইলাম এবং দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পর দিন সকালে উঠিয়া দেখি, রমানাথ নাই। মুদীকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল,

"রমানাথবাবু একটু আগে উঠে গেছেন।" তার পর আমার কোটের পকেটে হাত দিয়া দেখি, মনিব্যাগটা নাই! মনিব্যাগ নাই দেখিয়া, আমি একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম। কি সর্ব্বনাশ! এ নিশ্চয়ই সেই রমানাথের কাণ্ড! এই জন্যই সে কাল রাতে টাকার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল? ওঃ কি ভয়ানক ছেলে! আমি একেবারে অস্থির হইয়া নানা প্রকার বিপদের আশঙ্কা করিতে লাগিলাম। ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ আমার সোনার ঘড়ি ও চেইনের কথা মনে পড়িল। সেগুলি আমার বাক্সের মধ্যে ছিল। আমি তাড়াতাড়ি বাক্স খুলিয়া দেখিলাম, ঘড়ি ও চেইন লইতে পারে নাই।

আমি তখনই আবার বাক্স বন্ধ করিয়া কোন কথা না বলিয়া, রমানাথের অন্বেষণে বাহির হইলাম। কিন্তু বেলা প্রায় বারটা পর্য্যন্ত নানা স্থানে খুঁজিয়াও তাহার কোন সন্ধান পাইলাম না। পকেটে কয়েক আনা মাত্র পয়সা ছিল। একটা হোটেলে কিছু আহার করিয়া আবার রমানাথের অন্বেষণে বাহির হইলাম। কিন্তু কোথায়ও তাহাকে পাওয়া গেল না। তার পর দুই তিন দিন ধরিয়া ক্রমাগতঃ তাহাকে নানা স্থানে খুঁজিলাম, তবুও তাহার কোন সন্ধান করিতে পারিলাম না। ক্রমে পকেটের পয়সা কয়টাও ফুরাইয়া আসিল; আমি মহা বিপদে পড়িয়া গেলাম। বাড়ী যাইতে সাহায্য করা দূরে থাক্, এক বেলা খাইতে দিবে, এমন আত্মীয়ও আমার কেহ ছিল না! শেষে না খাইতে পাইয়াই বুঝি মরিতে হইল, ভাবিয়া আমি চারিদিক্ যেন অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম! এই সময়ে একদিন সন্ধ্যাকালে হঠাৎ পঞ্চাননের সহিত আমার দেখা হইল। আমাকে দেখিতে পাইয়াই পঞ্চানন তাড়াতাড়ি আমার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে মোহনলাল, তুমি এখনও বাড়ী যাও নি? হেড্মাষ্টার মশাই তোমার মাকে পত্র লিখেছেন; শুন্লাম তোমার মা তোমার জন্য বড়ই চিন্তিত হয়েছেন। তুমি আজই বাড়ী যাও।"

যে পঞ্চাননকে কয়েকদিন পূর্ব্বে প্রহার করিয়াছি, তাহার এ প্রকার ভদ্র ব্যবহারে লজ্জা ও ঘৃণায় আমার মস্তক নত হইয়া পড়িল। আমি মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলাম! আমাকে মাথা নীচু করিয়া থাকিতে দেখিয়া পঞ্চানন বলিল, "মোহনলাল, তোমার মুখ দেখে বেশ বুঝ্তে পারছি, তুমি লজ্জায় আমার সহিত কথা বল্তে পারছ না; কিন্তু সেজন্য তুমি এত দুঃখিত হ'য়ো না; তোমার যে বিশেষ কোন দোষ ছিল না, তা আমি জানি।" পঞ্চাননের মিষ্ট কথায় আমি আরও লজ্জিত হইলাম বটে, কিন্তু আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বলিলাম, "ভাই, যা হ'বার হ'য়ে গেছে, তুমি সেজন্য আমাকে ক্ষমা কর।" এই বলিয়া আমি বোর্ডিং ছাড়িবার পর হইতে

যাহা যাহা ঘটিয়াছিল একে একে সকল কথা তাহাকে বলিলাম। রমানাথ আমার দেড়শত টাকা ফাঁকি দিয়াছে শুনিয়া, রাগে পঞ্চাননের চক্ষু লাল হইয়া উঠিল। পঞ্চানন বলিল, "এরূপ হবে, আমি আগেই তা জান্‌তাম। রমার মত নীচ আমি আর দেখিনি! সে যা হ'ক, এখন আর দুঃখ করা বৃথা। আমি তোমাকে পাঁচটী টাকা দিচ্ছি, তুমি আজই বাড়ী চলে যাও। তোমার মা অত্যন্ত ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন।" আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, পঞ্চাননকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতে দিতে, তাহার নিকট হইতে পাঁচটী টাকা লইয়া, সেই রাত্রেই বাড়ী যাইবার জন্য ট্রেণে উঠিলাম। ট্রেণে উঠিয়া পঞ্চাননের মহত্ত্বের কথা ভাবিতে লাগিলাম। কি আশ্চর্য্য, মানুষ এমন করিয়াও ক্ষমা করিতে পারে! যাহার

কুমন্ত্রণায় আমি পঞ্চাননকে প্রহার পর্য্যন্ত করিয়াছি, আজ সেই ধূর্ত্ত রমানাথ কোথায়? প্রবঞ্চক সুবিধা পাইয়া আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে! আর পঞ্চানন আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া, আমাকে অযাচিত ভাবে সাহায্য করিল। এই অসময়ে তাহার সাহায্য না পাইলে, আমার কি দুর্দ্দশাই না হইত! তাহার দয়াতেই আজ আমি বাঁচিয়া গেলাম! যাহাকে বন্ধু মনে করিতাম, সেই দেখি, আমার মহাশত্রু, আর যাহাকে শত্রু ভাবিয়া ঘৃণা করিয়া আসিয়াছি, সেই আমার পরম বন্ধু! এতদিন আমি কি ভুলই করিয়াছি! এইরূপ নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। ঘুমাইবার পূর্ব্বে ঘড়ী ও চেইনটী খুব সাবধানে বাক্সের ভিতরে তুলিয়া রাখিলাম। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম জানি না, হঠাৎ বোধ হইল, যেন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির ফোঁটা আমার মুখে পড়িতেছে। তখন উঠিয়া দোর জানালাগুলি বন্দ করিয়া দিবার ইচ্ছা হইল বটে, কিন্তু উঠি উঠি করিয়া আবার তখনই ঘুমাইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টির বড় বড় কয়েকটা ফোঁটা মুখে আসিয়া পড়াতে, আমার আবার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দোর জানালা বন্দ করিবার জন্য আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম। কিন্তু বসিয়াই যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার চক্ষু স্থির হইয়া গেল! ভয়ে হাত পা যেন আড়ষ্ট হইয়া পড়িল! দেখিলাম, গাড়ীর ভিতরে অপর কোন যাত্রী নাই, কেবল দুইজন লোক আমার সম্মুখের বেঞ্চে বসিয়া রহিয়াছে। ক্ষীণ আলোকে তাহাদের মুখ ভাল করিয়া দেখা যাইতেছিল না বটে, কিন্তু তাহাদের চেহারা দেখিয়া আমার বড় ভয় হইতে লাগিল। যদি ইহারা ডাকাত হয়, যদি আমার ঘড়ী এবং চেইনের সন্ধান পাইয়াই ইহারা গাড়ীতে উঠিয়া থাকে, তাহা হইলে কি উপায়ে সেই গুলি রক্ষা করিব? এবং কি রূপেই বা আমার প্রাণ রক্ষা করিব? আমি এইরূপ নানা কথা ভাবিতেছি, এমন সময় তাহারা দুইজনে কথাবার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করিল।

১ম ব্যক্তি। "আর দেরী কেন? তুমি ক্লোরোফরমের শিশিটা বের কর।"

২য় ব্যক্তি। "তা আর বল্‌তে হবে না। লোকটা অজ্ঞান হ'বামাত্র কাজ শেষ কর্‌তে হবে। দেখো, সাবধান, ও যেন ঘণ্টা টান্‌তে না পায়।"

এইরূপ বলাবলি করিয়া, তাহারা আমার খুব কাছে আসিয়া বসিল। আমিও তাহাদের মুখের দিকে চাহিলাম। চাহিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে রাগে ও ঘৃণায় আমার সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া যাইতে লাগিল! দেখিলাম, দস্যু দুজন আর কেহ নয়, আমার চিরশত্রু নেপাল ও তাহার বন্ধু গোপীনাথ! কি, এত বড় বুকের পাটা! ইহারা আমার সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছে! আমার সমুদায় শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল! আর স্থির থাকিতে না

পারিয়া আমি কর্কশ স্বরে বলিলাম—"নেপাল, গুপীনাথ, তোমাদের এই কাজ? ভদ্র লোকের ছেলের ডাকাতি ব্যবসা! তোমাদের কি লজ্জা নেই?"

নেপাল। "দেখ, মিছে রাগারাগি রেখে দাও। যদি বাঁচ্‌বার সাধ থাকে, টিনের বাক্সটী আমাদের হাতে দেও। তা না হ'লে, তোমার ঘড়ী চেইন ত যাবেই, এমন কি, তোমার প্রাণও যেতে পারে! এই দেখ, আমাদের কাছে পিস্তল এবং ছোরা দুই-ই আছে।"

নেপালের কথা শুনিয়া, ভয়ের পরিবর্ত্তে আমার মনে অসীম সাহস আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি বলিলাম, "প্রাণ থাকৃতে আমি বাক্স দেব না; যদি আমাকে আগে খুন কর্‌তে পার, বাক্স পাবে, নচেৎ বাক্স কিম্বা ইহার মধ্যের এক কপর্দ্দকও পাবার আশা ক'র না।" এই কথা বলিতে বলিতে, গার্ডকে ডাকিবার জন্য আমি হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া ঘন্টা টানিতে গেলাম, কিন্তু নেপাল তাহার লৌহ মুষ্টির এক আঘাতে আমাকে পুনরায় বেঞ্চের উপর ফেলিয়া দিল। ঠিক সেই সময় গোপীনাথ তুলাতে ক্লোরোফরম্ মাখাইয়া আমার নাকের কাছে ধরিবার চেষ্টা করিল। সমুদায় গাড়ী দুর্গন্ধে পূর্ণ হইল। দস্যুরা পূর্ব্বেই দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। আমি গোপীনাথের হাত হইতে শিশিটা কাড়িয়া লইয়া, জানালার গ্লাসের উপর ছুড়িয়া দিলাম। ঝন্ ঝন্ করিয়া গ্লাস ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। তখন প্রাণপণ চেষ্টায় ছুটিয়া আমি জানালার ধারে গেলাম এবং সেই ভাঙ্গা কাচের ভিতর দিয়া বাহিরে গলা বাড়াইয়া, "খুন্ করিল, খুন্ করিল" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম। পর মুহূর্ত্তেই দস্যুরা আমাকে টানিয়া ভিতরে আনিয়া ফেলিল, এবং খুব জোরে আমার মুখ চাপিয়া ধরিল। আমি পুনরায় চীৎকার করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কণ্ঠের স্বর ফুটিল না; ক্রমে গলা শুকাইয়া আসিল! তাহার পর মনে হইল, যেন দস্যুরা আমাকে বাঁধিতেছে। তাহার পর আর কি হইল, আমার মনে নাই।

অনেকক্ষণ পরে আমার অল্প অল্প চেতনা হইলে দেখিলাম, গাড়ী খুব জোরে ছুটিতেছে। আমি উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই উঠিতে পারিলাম না। চীৎকার করিতে চেষ্টা করিলাম, আওয়াজ ফুটিল না। আস্তে আস্তে হাত সরাইয়া টিনের বাক্সটী খুঁজিলাম, সেটী পাওয়া গেল না। মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, ডাকাতেরাও পলায়ন করিয়াছে। আমার সমুদায় শরীর তখন রক্তারক্তি হইতেছিল, আর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছিল! এই সময়ে আমি হঠাৎ যেন একটা চীৎকার ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। অল্প পরেই গাড়ীর গতি একটু একটু করিয়া কমিতে লাগিল। পরক্ষণেই আমি "বগুলা, বগুলা" এই শব্দ বেশ স্পষ্টভাবেই শুনিতে পাইলাম। ষ্টেশনে গাড়ী থামিবামাত্র একজন টিকেট্ কলেক্টার

আসিয়া আমার গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল। অমনি আমি উঠিয়া বসিলাম, এবং বিশেষ বিস্ময় ও আনন্দের সহিত দেখিলাম, আমার বাক্স যেখানে ছিল, ঠিক সেই খানেই আছে। বলা বাহুল্য, আমার ঘড়ী ও চেইন চুরী যায় নাই; শরীর অক্ষত রহিয়াছে; এবং দরজা জানালা কিছুই ভাঙ্গে নাই! কি ভীষণ স্বপ্ন! এমন স্বপ্নও মানুষে দেখে! নেপালের প্রতি আমার আন্তরিক ঘৃণা ছিল; সেই ঘৃণা হইতেই যে এই স্বপ্নের উৎপত্তি, তাহাতে আর কোন সন্দেহ রহিল না! আমি জিনিস পত্র লইয়া ষ্টেশনে নামিয়া পড়িলাম এবং সেই অদ্ভুত স্বপ্নের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে, একখানি গাড়ী করিয়া সেখান হইতে বাড়ী রওনা হইলাম।

(ক্রমশঃ)

গ্লাডিয়েটার ক্রীড়া।

ইউরোপের মানচিত্রে তোমরা রোমনগর দেখিয়া থাকিবে। প্রায় দুই হাজার বৎসর গত হইল, এই নগর পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান ছিল। কি শিল্পে, কি সভ্যতায়, কি ব্যবসাবাণিজ্যে রোমীয়দের সমতুল্য আর কেহই ছিল না। কিন্তু রাজ্য-বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে রোমীয়দের স্বভাব-চরিত্র যার পর নাই জঘন্য হইয়া পড়িয়াছিল! যাহারা পূর্ব্বে বিনয়ী, পরিশ্রমী, মিতাচারী এবং সত্যপরায়ণ বলিয়া বিখ্যাত ছিল, সুখ এবং ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ক্রমে তাহারা গর্ব্বিত, বিলাসী এবং উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল! অবশেষে তাহাদের স্বভাব এতদূর বিকৃত হইয়া পড়িল যে, এমন কি, প্রকাশ্যভাবে অতি অন্যায় কার্য্য করিতেও তাহারা কুণ্ঠিত হইত না। ক্ষণিক সুখ ও আমোদ উপভোগের জন্য তাহারা এ প্রকার নিষ্ঠুর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিত যে, তাহা স্মরণ করিতেও হৃদয় কাঁপিয়া উঠে! এই সকল নিষ্ঠুরতার মধ্যে "কলিসিয়ম ক্রীড়া" সর্ব্বপ্রধান ছিল। রোমের নানাস্থানে এবং রোমাধিকৃত প্রায় প্রত্যেক সহরেই এই কলিসিয়ম বা ক্রীড়াগার নির্ম্মিত ছিল। কিন্তু রোমের কলিসিয়মের মত তত বড় এবং তেমন সুন্দর ক্রীড়াগার আর কোথাও ছিল না। প্রায় পনর বিঘা জমী ব্যাপিয়া সেই ক্রীড়াগারটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে সুবিস্তৃত বৃত্তাকার প্রাঙ্গন। সেই প্রাঙ্গনের চতুর্দ্দিকে দর্শকদিগের বসিবার জন্য গ্যালারি প্রস্তুত ছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, প্রায় ৯০০০০ লোক সেই গ্যালারিতে বসিয়া খেলা দেখিতে পারিত। প্রথম প্রথম সেই বিশাল ক্রীড়াস্থানে সার্কাসাদির ন্যায় নানাপ্রকার নির্দ্দোষ

ক্রীড়াই প্রদর্শিত হইত, কিন্তু নানাপ্রকার পাপাচারে রোমীয়গণ যতই অন্তঃসারশূন্য হইতে লাগিল, তাহাদের নিষ্ঠুরতাও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অতি জঘন্য আমোদ-স্পৃহা চরিতার্থ করিবার জন্য তাহারা জঙ্গল হইতে সিংহ, ব্যাঘ্র, মহিষ, গণ্ডার প্রভৃতি

দুরন্ত জন্তু ধরিয়া আনিয়া, সেই ক্রীড়া স্থানে ছাড়িয়া দিত, এবং হতভাগা বন্দী ও ক্রীতদাস-দিগকে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে বাধ্য করিত। কখন কখন সেই সকল দুর্দান্ত প্রাণীর সহিত মল্ল যুদ্ধ করিবার জন্য এক এক দল লোক প্রস্তুত করা হইত। এই সকল যোদ্ধা "গ্লাডিয়েটর" নামে বিখ্যাত ছিল। অতি সামান্য অস্ত্রশস্ত্র লইয়া এই গ্লাডিয়েটরদিগকে সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ করিতে হইত। কখন কখন বা তাহারা আপনা আপনি কাটাকাটি মারামারি করিয়া মরিতেও বাধ্য হইত। যখন দুরন্ত জন্তুর গ্রাসে পড়িয়া, অথবা প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য গ্লাডিয়েটরের অস্ত্রাঘাতে আহত হইয়া, কোন হতভাগ্য রক্তাক্ত দেহে কাতরকণ্ঠে চীৎকার করিত, তখন উপস্থিত দর্শকগণের প্রাণে দয়ার উদ্রেক

হওয়া দূরে থাক্, বরং উল্লাসের সহিত করতালি দিয়া, তাহারা আপনাদের অমানুষিক পশুত্বের পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত হইত না! কি ভয়ানক ব্যাপার! মানুষ কতদূর পশুত্ব প্রাপ্ত হইলে, অপর নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে দুরন্ত জন্তুর গ্রাসে, অথবা বলবান প্রতিদ্বন্দ্বীর হস্তে, ক্ষত বিক্ষত শরীরে ছট্‌ফট্ করিতে দেখিয়া, আনন্দ প্রকাশ করিতে পারে, তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, এইরূপ নিষ্ঠুরতা ভিন্ন রোমীয়দের সুখস্পৃহা আর কিছুতেই চরিতার্থ হইত না! অধিকতর দুঃখের বিষয় এই, যে রোমীয় নারীগণও পশুপ্রকৃতি পুরুষদিগের সহিত ক্রীড়াস্থানে বসিয়া, সেই সকল নিষ্ঠুর ক্রীড়া দর্শন করিতে লজ্জা বোধ করিত না। সুকোমল নারী প্রকৃতির ইহা অপেক্ষা আর কি হীনাবস্থা হইতে পারে!

সময় সময় এই অত্যাচারের পরিমাণ এতদূর বৃদ্ধি পাইত যে, মনে হইলে এখনও শরীর শিহরিয়া উঠে! সম্রাট্ ক্লডিয়াসের সময়, একবার রোমীয় সৈন্যগণ কোন একটী যুদ্ধে জয়লাভ করে। তাহাতে সমুদায় রোমে আনন্দ উৎসব পড়িয়া যায়। অন্যান্য নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ ভিন্ন সেই উৎসবে ক্রমান্বয়ে ১২৩ দিন ধরিয়া কলিসিয়ম ক্রীড়া হয়।
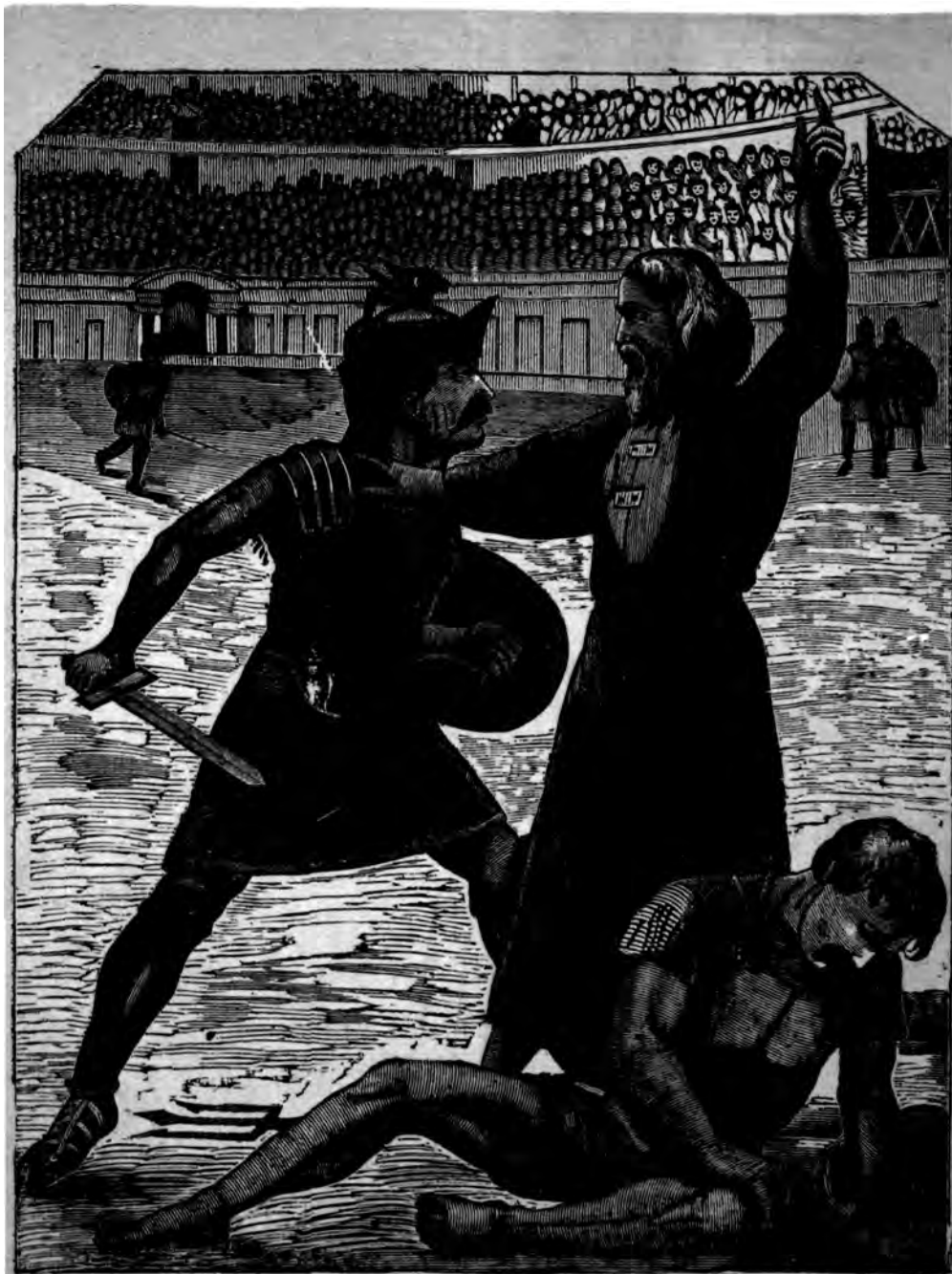
"আপনার বিশাল বাহুযুগল বিস্তার করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, কি কর, কি কর।" (৮৭ পৃষ্ঠা)

১১০০০ হিংস্র জন্তু এবং ১০০০০ গ্লাডিয়েটর সেই সময় ক্রীড়া স্থানে পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিয়া, প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হয়! আর একবার অন্য একটী উৎসব উপলক্ষে ৫০০ শত সদ্যধৃত সিংহ এবং বহুসংখ্যক গ্লাডিয়েটর ক্রমাগত পাঁচ দিন ধরিয়া যুদ্ধ করে। এই পাঁচ দিনে সমুদায় সিংহ নিহত হইয়াছিল, কিন্তু কতগুলি গ্লাডিয়েটর যে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, ইতিহাসে তাঁহার উল্লেখ নাই।

কিরূপে এই নিষ্ঠুর ক্রীড়া চিরদিনের মত বিলুপ্ত হইল, এখন সেই বিষয়ে তোমাদিগকে কিছু বলিব। ক্রমাগত বিলাসিতা এবং পাপাচারে ডুবিতে ডুবিতে রোমীয়গণ নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া, যখন চারিদিক হইতে শত্রু আসিয়া রোম আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, সেই সময়ে 'এলারিক' নামে এক রোমীয় সেনাধ্যক্ষ এক দল প্রবল শত্রুকে পরাজিত করিয়া রোমনগর রক্ষা করেন। তাঁহার এই মহৎ কার্য্য চিরস্মরণীয় করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে আনন্দ উৎসব পড়িয়া গেল এবং সেই সঙ্গে উৎসবের প্রধান অঙ্গ কলিসিয়ম ক্রীড়ারও আয়োজন হইল। প্রথম প্রথম নানাপ্রকার নির্দ্দোষ খেলা প্রদর্শিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে পিশাচ রোমীয়গণের মনস্তুষ্টি হইল না। অবশেষে অস্ত্রধারী গ্লাডিয়েটরগণ ক্রীড়াচ্ছলে পরস্পরের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিয়া, দর্শকদিগের প্রাণে আনন্দ দিবার জন্য সেই স্থানে উপনীত হইল। ক্রমে তাহাদের যন্ত্রণাসূচক কাতর ধ্বনিতে এবং দর্শকগণের পৈশাচিক মহোল্লাসে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল! এই সময়ে এক আকস্মিক্ ঘটনা ঘটিল। নির্দ্দোষ হতভাগ্য গ্লাডিয়েটরগণকে বিনা কারণে এরূপ মারামারি কাটাকাটি করিতে দেখিয়া, রোম-প্রবাসী এক বৃদ্ধ ধার্ম্মিকের প্রাণে বিষম আঘাত লাগিল! তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, ছুটিয়া ক্রীড়া স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং আপনার বিশাল বাহুযুগল বিস্তার করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "কি কর, কি কর, এমন অন্যায় কার্য্য করিও না! মানুষ হইয়া নিরপরাধ মনুষ্যের রক্তে এমন করিয়া আপনাদের হস্ত কলঙ্কিত করিও না! ঈশ্বরের সম্মুখে তোমাদের এই অন্যায় কার্য্য কিরূপে সমর্থন করিবে, একবার চিন্তা কর!" ধার্ম্মিক ব্যক্তির হিতবাক্যে নরপিশাচ রোমীয়দের চিত্ত বিচলিত হইল না। সকলে চীৎকার করিয়া তাঁহাকে ক্রীড়াস্থল হইতে দূর করিয়া দিতে বলিল। কিন্তু তিনি নিরস্ত হইবার লোক ছিলেন না, একেবারে ছুটিয়া গিয়া, সেই নিষ্ঠুর ক্রীড়াতে প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে উদ্যত হইলেন; এবং কাতর-কণ্ঠে দর্শকদিগের প্রাণে দয়ার উদ্রেক করিতে চেষ্টা করিলেন! কিন্তু তাঁহার কথায় কেহই কর্ণপাত করিল না। চতুর্দ্দিক হইতে বহু সংখ্যক ব্যক্তি চীৎকার করিয়া বলিল,

"এ লোকটা রাজদ্রোহী, ইহাকে মারিয়া ফেল।" অমনি দেখিতে দেখিতে শত শত অস্ত্র এবং প্রস্তর খণ্ড তাঁহার পবিত্র দেহের উপর বর্ষিত হইল! তিনি রোমীয় পশুগণের হস্তে প্রাণত্যাগ করিলেন!

তিনি মরিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে একটী ভীষণ নিষ্ঠুরতা চিরদিনের জন্য জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইল। যে রোমীয় নরনারী সহস্র সহস্র নিরপরাধ ব্যক্তির মৃত্যু দেখিয়া, অসীম সুখ উপভোগ করিয়াছে, একটী সাধুর অপঘাত মৃত্যু তাহাদের সেই কঠোর প্রাণকেও বিগলিত করিয়া তুলিল! কতদূর পশুত্ব প্রাপ্ত হইলে, লোকে এইরূপ ধার্ম্মিকের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিতে পারে, তাহাও ক্রমে তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইল! তখন সেই ধার্ম্মিক ব্যক্তির শোকে চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল! তাহার শুভ ফল এই হইল যে, সেই দিন হইতে গ্লাডিয়েটর ক্রীড়া চিরদিনের মত শেষ হইল! এই ঘটনার পর কেবল রোমে নহে, রোম-অধিকৃত কোন স্থানেও আর কখন গ্লাডিয়েটর ক্রীড়া হয় নাই। সেই ধার্ম্মিক সাধু আপনার প্রাণ দিয়া, জগতের একটী পাশবিক অত্যাচার বিদূরিত করিয়া, স্বর্গে চলিয়া গেলেন!

হাসিরাশি।

তার নাম রেখেছি বাব্‌লা রাণী, একরত্তি মেয়ে।
হাসিখুসি চাঁদের আলো মুখটি আছে ছেয়ে।
ফুট্‌ফুটে তার দাঁত ক'খানি, পুট্‌পুটে তার ঠোঁট্।
মুখের মধ্যে কথাগুলি সব উলোট্‌ পালোট্।
কচি কচি হাত দুখানি, কচি কচি মুঠি,
মুখ্‌ নেড়ে কেউ কথা ক'লে হেসেই কুটি কুটি।
তাই তাই তাই তালি দিয়ে দুলে দুলে নড়ে,
চুলগুলি সব কালো কালো মুখে এসে পড়ে।
"চলি—চলি—পা—পা—" টলি টলি যায়,
গরবিণী হেসে হেসে আড়ে আড়ে চায়।
হাত্‌টি তুলে চুড়ি দু-গাছি দেখায় যাকে তাকে,
হাসির সঙ্গে নেচে নেচে নোলক দোলে নাকে।

রাঙা দুটী ঠোঁটের কাছে
মুক্ত' আছে কোলে',
মায়ের চুমোখানি যেন
মুক্ত' হয়ে দোলে!
আকাশেতে চাঁদ দেখেছ,
দুহাত তুলে চায়,
মায়ের কোলে দুলে দুলে
ডাকে আয় আয়।
চাঁদের আঁখি জুড়িয়ে গেল,
তার মুখেতে চেয়ে,
চাঁদ ভাবে কোথেকে এল
চাঁদের মত মেয়ে!
কচি প্রাণের হাসিখানি
চাঁদের পানে ছোটে,
চাঁদের মুখের হাসি, আরো
বেশী ফুটে ওঠে।

এমন সাধের ডাক শুনে চাঁদ কেমন ক'রে আছে,
তারাগুলি ফেলে বুঝি নেমে আস্‌বে কাছে!
সুধা মুখের হাসিখানি চুরি করে নিয়ে,
রাতারাতি পালিয়ে যাবে মেঘের আড়াল দিয়ে।

রামধন।

বাল্যকালেই রামধন পিতৃহীন হয়। পৃথিবীতে এক মা ভিন্ন তার আর কেহ ছিল না। রামধনের বয়স যখন ২০ বৎসর, তখন একদিন রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে, সে দেখিতে পাইল, কিছু দূরে কয়েকজন পথিক একটা পুকুরের পাড়ে গর্ত্ত খুঁড়িয়া উনান প্রস্তুত করিতেছে। দেখিয়া রামধন ভাবিল, ইহারা নিশ্চয়ই চোর, চোর না হইলে, পুকুরপাড়ে সিঁদ কাটিবে

কেন ? ইহারা নিশ্চয়ই পুকুর চুরি করিতে আসিয়াছে। এই ভাবিয়াই, রামধন ছুটিয়া গ্রামের দশজনকে গিয়া সংবাদ দিল। তাহারা রামধনের কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল, এবং তাহার বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া, আশ্চর্য্য হইয়া গেল! পাড়ার কতকগুলা বকাটে ছেলেও রামধনের কথা শুনিয়াছিল। তাহারা ইহার পর হইতে রামধনকে দেখিতে পাইলেই—

বুদ্ধিমান রামধন, সাবধানে থেকো,
নাকে মুখে ছিপি এঁটে বুদ্ধি ধরে রেখো!

বলিয়া ক্ষেপাইত। একদিন সন্ধ্যাকালে একটী মেয়ে কূপ হইতে জল তুলিতে তুলিতে পথে রামধনকে দেখিতে পাইল। দেখিয়াই বলিল, "রামধন, এই জলের কলসীটা তুলে দাও না।" রামধন কূপের কাছে আসিলেই কিন্তু সে মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে—

বুদ্ধিমান রামধন, সাবধানে থেকো,
নাকে মুখে ছিপি এঁটে বুদ্ধি ধরে রেখো!

বলিয়া, তাহাকে ক্ষেপাইতে আরম্ভ করিল। সামান্য একটা মেয়ে, সেও রামধনকে ক্ষেপাইবে? তাহার আর সহ্য হইল না। সে এক ধাক্কা দিয়া, মেয়েটীকে কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিল।

সন্ধ্যার পরে রামধন বাড়ীতে আসিলে, তাহার মা বলিল, "রামধন, তোকে না আমি বাড়ী থাকতে বল্লাম, তুই আবার বেরিয়েছিলি? সকলে তোকে এত ক্ষ্যাপায়, তোর কি লজ্জা নেই?"

"সকলে আমাকে ক্ষ্যাপায়?—আর ক্ষ্যাপাতে হয় না! আজ একটা মেয়ে ক্ষেপিয়েছিল, তার প্রতিফল পেয়েছে। তার ঘাড় ধরে আমি কূয়োর মধ্যে ফেলে দিছি। হা, হা, কেমন জব্দ, এতক্ষণে সে মরে ফুলে উঠেছে!"

"কি সর্ব্বনাশ, কি সর্ব্বনাশ! নিশ্চয়ই রামধনের ফাঁশী হবে," এই ভাবিতে ভাবিতে রামধনের মা তখনই সেই কূপের নিকট ছুটিয়া গেল, এবং অনেক কষ্টে বালিকার মৃত-দেহ উঠাইয়া, অনেক দূরে এক নদীর ভিতর, তাহার গলায় পাথর বাঁধিয়া ফেলিয়া দিল। ফিরিয়া আসিবার সময়, রামধনের মা পথে একটা মরা রামছাগল দেখিতে পাইল। সে সেটাকে টানিয়া, সেই কূপের মধ্যে ফেলিয়া বাড়ীতে চলিয়া আসিল।

রামধনের মা বাড়ীতে আসিয়া দেখিল, রামধন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তখন পথ ঘাট লোকে লোকারণ্য। মেয়েটীকে খুঁজিবার জন্য চারিদিকে লোক হাঁটাহাঁটি ছুটাছুটি করিতেছে। রামধন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, না ভালই হইয়াছে! জাগিয়া থাকিলে হয়ত

এতক্ষণে সকল কথা বলিয়া ফেলিত। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে, রামধনের মাও ঘুমাইয়া পড়িল। সকালে উঠিয়া দেখে, সর্ব্বনাশ! রামধন অগ্রেই উঠিয়া কোথায় গিয়াছে। এই দেখিয়াই সে ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িল।

এদিকে রামধন বাড়ীর বাহির হইয়াই দেখিল, পথে ঘাটে লোকের বড় ভিড়। দেখিয়াই সে আশ্চর্য্য হইয়া, একজনকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে, ব্যাপারটা কি?"

তখন পাঁচ ছয় জনে উত্তর করিল, "ব্যাপার আর কি! নীমু মোড়লের মেয়ে কাল সন্ধ্যার সময় কূয়োতে জল তুল্‌তে গিয়েছিল, তাকে আর পাওয়া যাচ্ছে না।"

"এই ব্যাপার, এতেই এত গোলমাল! তাকে যে আমি কূয়োর মধ্যে ঠেলে ফেলে দিছি। তোমরা সেই কূয়োর মধ্যে খোঁজ্ করগে, তাকে পাবে এখন!"

রামধনের কথা শুনিয়া, মেয়েটির পিতা ও আর কয়েক ব্যক্তি তাহাকে ধরিয়া বলিল, "চল, কোথা থেকে কেমন করে ফেলে দেছ, দেখাবে চল।" রামধন তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। পথে কেহ কেহ বলিল, "ও একটা আহাম্মক, ওর কথায় বিশ্বাস করে, কূয়ো খুঁজ্‌তে যাওয়া বৃথা।" অন্যান্য সকলে বলিল, "ভাল দেখাই যাক্ না, ও কি করে!"

কূপের নিকট উপস্থিত হইয়া রামধন বলিল, "তোমরা আমার কোমরে একগাছা দড়ি বেঁধে, আমাকে নামিয়ে দাও। আমি এখনই মেয়েটাকে তুলে আন্‌ছি।"

রামধনের কথায়, তাহার কোমরে একগাছি দড়ি বাঁধিয়া, কয়েক জনে তাহাকে কূপের মধ্যে নামাইয়া দিল।

রামধন জলের উপর ভাসিয়া একবার এদিক ওদিক চাহিল, তারপর টুপ্ করিয়া এক ডুবে একেবারে তলদেশে উপস্থিত হইল ; একটু পরে ভাসিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাগো, তোমাদের মেয়ের কি দুটো শিং ?"

রামধনের কথা শুনিয়া অনেকেই হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল, কিন্তু মেয়ের পিতা চীৎকার করিয়া বলিল, "রামধন, মিছে তামাসা রাখ ; শীঘ্র মেয়েটিকে তুলে আন।"

রামধন আবার ডুবিল ; এবং একটু পরে উঠিয়া বলিল, "হ্যাগো, তোমাদের মেয়ের কি চারখানা ঠ্যাং।" রামধনের কথায় আবার সকলে হাসিয়া উঠিল। মেয়ের পিতা ব্যস্ত ভাবে বলিল, "রামধন, তোমাকে ভাল করে বল্‌ছি, দেহটা শীঘ্র উঠিয়ে আন। তা না হলে ভাল হবে না!" রামধন পুনরায় ডুবিল, কিন্তু এবারেও সে ভাসিয়া উঠিয়া বলিল, "হ্যাগো, তোমাদের মেয়ের লেজ্‌টা কত বড় ? আর তার বেশ লম্বা লম্বা দাড়ি আছে কি ?" মেয়ের পিতার আর সহ্য হইল না। সে কর্কশস্বরে বলিল, "এবার যদি উঠিয়ে না আন, আমরা দড়ি কেটে দিয়ে চলে যাব। তুমি কূয়োর মধ্যেই মরে থাক্‌বে।"

রামধন ভয় পাইয়া আবার ডুবিল। সে কি উঠাইয়া আনে, দেখিবার জন্য সকলে এক দৃষ্টে কূপের ভিতর চাহিয়া রহিল। ওমা এ কি! এ যে একটা মরা রামছাগল! রামধন রামছাগলের দেহটা লইয়া ভাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই কি তোমাদের মেয়ে ?"

রামধনের কাণ্ড দেখিয়া, উপস্থিত লোক জনের মধ্যে একটা তুমুল গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। কেহ কেহ হাসিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল, কেহ কেহ রাগে চীৎকার করিতে লাগিল। কেহ কেহ বলিল, "ওটা একটা আহম্মক, ওর কথায় বিশ্বাস করে নাহ'ক আমাদের সময় নষ্ট হল। ওকে এই কূয়োর মধ্যে রেখে, চল আমরা যাই।" কিন্তু মেয়ের পিতা বলিল, "আমার যা হবার হয়েছে, ওকে মেরে আর লাভ কি ? ওকে উঠিয়ে ফেলে, চল আমরা অন্য স্থানে খোঁজ করিগে।" তখন রামধনকে উপরে উঠাইয়া তাহারা সকলে চলিয়া গেল। রামধন হাসিতে হাসিতে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল।

রামধনের মা এতক্ষণ ভয়ে ও দুঃখে মৃতপ্রায় হইয়া, ঠাকুরের কাছে কত কি মানত করিতেছিল, কত প্রার্থনা করিতেছিল। রামধনকে দেখিতে পাইয়া, সে হারানিধি পাইল ভাবিয়া, আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

ইহার কিছু দিন পরে,রাস্তা দিয়া একজন চৌকীদার,এক কলসী ঘি লইয়া যাইতে যাইতে কিছু দূরে রামধনকে দেখিতে পাইল। দেখিয়া তাহাকে ডাকিয়া বলিল,"এই রামধন,আমার ঘিয়ের কলসীটা নিয়ে চল, তোকে একটা আদ্‌লা দেব।" ঘিয়ের কলসী মাথায় লইয়া

রামধন ভাবিতে লাগিল, "আহা, আমার কি অদেষ্ট রে! আজ কপালগুণে আমার কেমন একটা রোজ্‌গার জুটে গেল! এত ধন নিয়ে আমি কি করবো?—ঠিক, ঠিক,—

আজই আমি আদ্‌লা দিয়ে কিনবো যুড়ি গাড়ী,
একেবারে ছুটিয়ে দেবো রাজার সদর বাড়ী;
দাও রাজার ধন মাণিক, রাজা আমাকে ভাবিয়ে,
ঝঁাক জমকে মেয়ের সাথে দিবেন আমার বিয়ে!

এই ভাবিয়া রামধন যাই আনন্দে ও উৎসাহে নাচিয়া উঠিয়াছে, অমনি তাহার মাথা হইতে ঘিয়ের কলসীটা পড়িয়া, ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল!

ঘিয়ের কলসী চুরমার হইল দেখিয়া, চৌকীদার রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে রামধনকে বলিল, "আহাম্মক, দেখ্ দেখি, কি করলি? আমি রাজার জন্যে ঘি নিয়ে যাচ্ছি! তুই সেই ঘি ফেলে দিয়ে, একেবারে পাঁচ পাঁচটা টাকার মাল নষ্ট করলি! চল্ বেটা, রাজার কাছে চল্; আজ তোকে ঘা কতক উত্তম মধ্যম দেওয়াবো।" এই বলিয়া চৌকীদার রামধনকে লইয়া রাজার কাছে চলিল।

যাইতে যাইতে তাহারা দেখিল, এক সহরের সিংহদরজার কাছে অনেক লোক জড় হয়ইয়াছে আর খুব গোলমাল করিতেছে। এত ভীড় হইবার কারন কি, জিজ্ঞাসা

করায় দারোয়ান বলিল,—"কাল আমাদের সহরের এক বড়মানুষের ছেলের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এ দেশের প্রথা এই যে, বিবাহের পর দিন বর কণে দুজনে দুইটী হাতীতে চড়িয়া এই দরজার ভিতর দিয়া সহরে প্রবেশ করিবে। এই প্রথা অনুসারে বর কণে এখানে উপস্থিত হইয়াছে। বরের হাতীটী ছোট, তাই বর সহজেই দরজা পার হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে, কিন্তু কণের হাতী বড় বলিয়া সে কিছুতেই দরজা পার হইতে পারিতেছে না। মেয়ের মাথা ছাদে ঠেকিতেছে। এখন হাতীর পা কয়খানি কাটিয়া ছোট না করিলে, আর উপায় নাই। কিন্তু এই হাতীটী যার সে কিছুতেই এই প্রস্তাবে সম্মত হইতেছে না। এই ব্যাপার লইয়াই এত গোলযোগ।"

তাহার কথা শুনিয়া রামধন বলিল,—"এ আর এমন শক্ত কাজ কি? আমি এখনই ইহার উপায় করিতেছি।" এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি একটা ঘোড়ার পীঠে উঠিয়া বসিল এবং তলোয়ারখানি বাহির করিয়া, এক কোপে কণের গলা কাটিয়া বলিল, "এইবারে হাতী চালাইয়া দাও, মেয়ের মাথা আর ছাদে ঠেকিবে না।" রামধনের কাণ্ড দেখিয়া উপস্থিত সকলে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। বর ঘোড়া হইতে নামিয়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "পাষণ্ড, তোর এই কাজ! তুই আমার সর্ব্বনাশ করলি? চল্ নরাধম, রাজার বাড়ী চল্, ঘাতকের হাতে আজ তোর কাটামুণ্ড দেখ্‌বো তবে ছাড়্‌বো।"

কিছুদূর গিয়া পথের পাশে তাহারা একখানি কুঁড়ে ঘর দেখিতে পাইল। সেই ঘরে এক বুড়া ও বুড়ী বাস করে। বুড়ী রামধনকে দেখিতে পাইয়া, একটু মজা করিবার জন্য বলিল, "কি রামধন, তুমি না কি বড় বুদ্ধিমান! 'ক' থেকে 'গ' পর্য্যন্ত পড়ে ফেলতে তোমার নাকি এক বছরের বেশী সময় লাগেনি? আচ্ছা, কেমন করে রাবণ ম'ল আর লঙ্কা নষ্ট হ'ল, বল দেখি?"

বুড়ীর তামাসায় রামধন জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, "এই কি তামাসার সময়? দেখ্‌ছ না, আমার কি বিপদ উপস্থিত!"

কিন্তু বুড়ী কিছুতেই ছাড়িল না। তখন রামধন চৌকীদারকে ডাকিয়া বলিল, "দেখ, আমার কোন দোষ নেই। বুড়ী কিছুতেই ছাড়বে না।" এই বলিয়া সে একখানি কুঠার লইয়া বুড়ার গলায় এক কোপ দিয়া বলিল, "এই রকমে রাবণ মরেছিল।" তাহার পর এক নূড়া খড় জ্বালিয়া কুঁড়ে ঘরে লাগাইয়া দিয়া বলিল, "এই রকমে লঙ্কা নষ্ট হয়েছিল।"

রামধনের অত্যাচারে বুড়ী রাগে ও দুঃখে চীৎকার করিতে করিতে বলিল, "গণ্ডমূর্খ চল, এখনই তোকে রাজার কাছে নিয়ে যাই। তুই যেমন আমার সর্ব্বনাশ করলি, আমিও তেমনি তোর সর্ব্বনাশ করবো! তোকে ফাঁশীতে ঝোলাবো।" এই বলিয়া সেই বুড়ীও তাহাদের সহিত চলিল।

কিছুক্ষণ পরে তাহারা রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইয়াই দেখিল, রাজা সভাতে বসিয়া বিচার করিতেছেন; রামধনকে লইয়া চৌকীদার, বুড়ী এবং অপর এক ব্যক্তিকে সেখানে উপস্থিত হইতে দেখিয়া, রাজা তাহাদের নালিশ শুনিতে চাহিলেন।

চৌকীদার অগ্রসর হইয়া বলিল, "হুজুর, আপনার জন্তে আমি পাঁচ টাকার ঘি কিনে আন্‌ছিলাম। পথে রামধনকে দেখ্‌তে পেয়ে বল্‌লাম, 'রামধন, তুই এই ঘিয়ের কলসীটা নিয়ে চল, তোকে কিছু পয়সা দেব।' এই কথা বল্‌বামাত্র রামধন ঘিয়ের কলসী মাথায় তুলে নিল। তার পর আমরা কিছু দূর এসিছি, এমন সময় রামধন, কি জানি কি ভেবে, হঠাৎ মাথা নাড়িল, অমনি ঘিয়ের কলসীটা মাটীতে পড়ে চুরমার হয়ে গেল। লোকটা আপনার খাবার ঘি সব নষ্ট করেছে, হুজুরের কাছে প্রার্থনা, ইহার দোষের উচিত শাস্তি দিন।"

রাজা রামধনের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, তোমার নাম কি?"

" আজ্ঞে, আমার নাম রামধন। হুজুর চৌকীদারের নালিশ শুনেছেন, এখন অনুমতি পেলে এই অধীন কিছু বলে।"

রাজা অনুমতি করিলেন। তখন রামধন বলিতে আরম্ভ করিল, "হুজুর, আপনার চৌকী-দার আমাকে আদ পয়সা দিবে বলিয়া, ঘিয়ের কলসীটা আমার মাথায় তুলিয়া দিলে পর, আমি ভাবিতে লাগিলাম, এত ধন লইয়া আমি কি করিব! ভাবিতে ভাবিতে স্থির করিলাম, যে——

আজই আমি আদ্‌লা দিয়ে, কিন্‌বো ঘুড়ি গাড়ি।
একেবারে ছুটিয়ে দেবো রাজার সদর বাড়ী!
সাত রাজার ধন মাণিক, রাজা আমাকে ভাবিয়ে,
জঁাক জমকে মেয়ের সাথে দিবেন আমার বিয়ে!

এই ভাবিয়া যেই আমি আহ্লাদে নাচিয়া উঠিয়াছি, অমনি মাথা হইতে ঘিয়ের কলসীটা পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। আমি ত আর ইচ্ছা করে ঘিয়ের কল্‌সী ফেলে দিইনি! এখন বিচার করে আপনার যেরূপ ইচ্ছে সাজা দিন।"
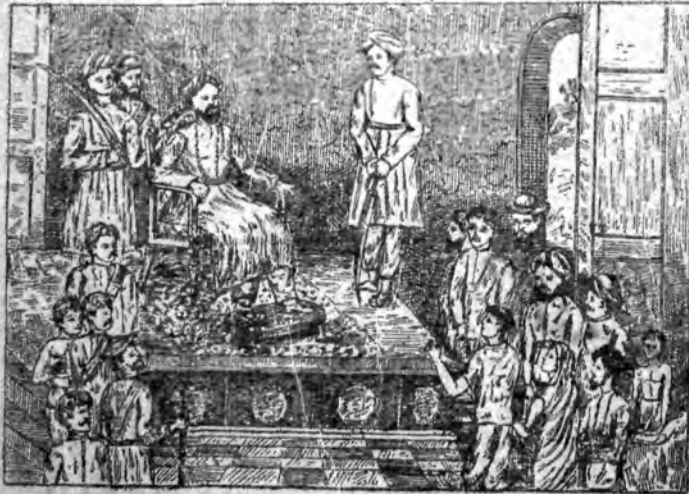
রামধনের কথা শুনিয়া রাজা তাহার বুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় পাইলেন, এবং হাসিতে হাসিতে চৌকীদারকে বলিলেন, "পাঁড়ে জি, তোমার চেয়ে রামধনের ক্ষতি অনেক বেশী; তোমার শুধু পাঁচটা টাকা নষ্ট হয়েছে মাত্র, কিন্তু রামধনের বিয়েটা পর্য্যন্ত গোলমাল হয়ে গেছে! সুতরাং আমি তাকে ক্ষমা করলাম।"

তার পর বর অগ্রসর হইয়া বলিল, "প্রভু, এই লোকটা আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। আমি বিবাহ করিয়া কণে লইয়া দেশে ফিরিতেছিলাম, এমন সময় এই নরাধম আমার স্ত্রীর গলা কাটিয়া ফেলিয়াছে। হুজুর, আমি কোন অপরাধ করি নাই।" বরের কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "রামধন এ ত বড় অন্যায়! তুমি এমত কাজ কর্‌লে কেন?"

"হুজুর, আমি কোন অন্যায় কাজ করি নাই। উঁচু হাতীতে চড়িয়া কণে কিছুতেই দরজা পার হইতে পারিতেছিল না দেখিয়া, আমি তাহার গলা কাটিয়া ছোট করিয়া দিয়াছি। আমি গলা কাটিয়া না দিলে, কণে কিছুতেই সহরে ঢুকিতে পারিত না। এখন আপনিই বিচার করিয়া বলুন, আমার অপরাধটা কি?"

রামধনের যুক্তি শুনিয়া রাজা বলিলেন, "তা ত বটেই, রামধন উচিত কাজই করিয়াছে। মেয়েটীর সমুদায় শরীর বাহিরে পড়িয়া থাকিত, এখন কেবল তাহার মাথাটী বাহিরে রহিল, এত ভালই হইয়াছে! ইহাতে রামধনকে বরং প্রশংসা করিতে হয়।"

অবশেষে বুড়ী রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, "হুজুর রামধন আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। একখানা কুড়ুল দিয়া আমার স্বামীর গলা কাটিয়াছে, আর আগুন দিয়া আমার ঘর পুড়াইয়া দিয়াছে।"

শুনিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন রামধন, বুড়ীর কথা কি সত্য?"

"আজ্ঞে, বুড়ী যা বল্‌চে তা ঠিক। কিন্তু আমার কোন দোষ নেই; বুড়ী বার বার আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, 'কেমন রামধন, রাবণ ম'ল কি করে, আর লঙ্কা নষ্ট হ'লই বা কি করে?' আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও বুড়ীর হাত ছাড়াইতে পারিলাম না। শেষে ভাবিলাম, বুড়ীর কথার উত্তর মুখে বলিয়া কি লাভ, কাজেই দেখাইয়া দি। এই ভাবিয়া, আমি বুড়োর গলায় এক কোপ দিয়া বলিলাম, 'এই রকমে রাবণ মরেছিল,' আর ঘরের চালে আগুন লাগাইয়া দিয়া বলিলাম, 'এই রকমে লঙ্কা নষ্ট হয়েছিল।' এখন প্রভু বিচার করুন, ইহাতে আমার কি দোষ! ও যা জান্‌তে চেয়েছিল, আমি তাই ভাল করে দেখিয়ে দিছি।"

রামধনের কথা শুনিয়া রাজা হাসিতে হাসিতে, বুড়ীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার সর্ব্বনাশ হয়েছে বটে, কিন্তু ইহাতে আমি রামধনের কোন দোষ দেখিতে পাই না। তুমি যাহা যাহা জানিতে চাহিয়াছিলে, সে ভাল করিয়া তাহা [illegible]াইয়া দিয়াছে। সুতরাং আমি তাহাকে ক্ষমা করিলাম।" এই বলিয়া রাজা রামধনকে ছাড়িয়া দিতে হুকুম করিলেন।

রাজার ন্যায়বিচারে মুক্তিলাভ করিয়া, রামধন সবেমাত্র বাহিরে আসিয়াছে, এমন সময়

একটা মশা উড়িয়া আসিয়া, তাহার মুখে দংশন করিল। ইহাতে বীর রামধনের রাগ দেখে কে? সে এক চাপড়ে মশার প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু এরূপ কার্য্যে সাধারণতঃ যে ফল ফলিয়া থাকে, রামধনের অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিল। মশা কোথায় উড়িয়া পলাইল, তাহার ঠিকানা নাই, লাভের মধ্যে, মশা মারিতে রামধনের গালে চড়! রাজবাড়ীর মশার এইরূপ বেয়াদবী! রামধনের আর সহ্য হইল না। সে ছুটিয়া রাজার কাছে আসিয়া মশার নামে নালিশ করিল। রাজা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "রামধন আজ হইতে আমি তোমাকে এই অধিকার দিতেছি যে, মশা দেখিলেই তুমি তাহাকে মারিতে পারিবে।" রাজার কথা শেষ হইতে না হইতে রামধন রাজার নাকের ঠিক উপরে একটা মশা দেখিতে পাইল। দেখিয়াই সে বিরাশী সিক্কা ওজনের এক কীল তুলিয়া সেই নাকের উপর বসাইয়া দিল। সেই এক কীলেই রাজা অজ্ঞান হইয়া সিংহাসন হইতে পড়িয়া গেলেন।

অনেকক্ষণ পরে রাজার চেতনা হইলে, তিনি রামধনকে কয়েদীর বেশে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে দেখিলেন। দেখিয়া বলিলেন, "এ কি! রামধনের এ দুরবস্থা কেন? উহাকে কে বাঁধিল? উহার ত কোন দোষ নাই। ও আমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছে মাত্র। উহাকে [illegible]নই ছাড়িয়া দাও।"

রাজার হুকুম শুনিয়া প্রহরীরা তাহার দেহের বন্ধন খুলিয়া দিল। রাজবাটী হইতে বাহির হইয়া রামধন হাসিতে হাসিতে, ছুটিয়া মায়ের কাছে গিয়া সকল কথা বলিল।

রামধনের মা তাহাকে পাইয়া, একেবারে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল! ভাবিল, 'আমার কি কপাল!'

আহা, রামধনের মা ঠিকই ভাবিয়াছে! এমন বুদ্ধিমান ছেলে কি সহজে মিলে।

পথিক।

কতকগুলি বালক মণ্ডলাকারে বসিবে। অপর চারিটি বালক পথিক সাজিয়া, চারিদিক হইতে ক্রমে ক্রমে তাহাদের নিকট উপস্থিত হইবে। এক এক জন পথিক আসিলে, বালকেরা তাহাকে প্রশ্ন করিবে আর সে উত্তর দিবে।

(প্রথম পথিকের আগমন)

বালকগণ। কোথা থেকে আস্‌ছ তুমি ছোট্ট মানুষটি ?
গল্প যদি বল্‌তে পার বল ত একটী।

১ম পথিক। আস্‌ছি আমি সাদা সাদা ভাল্লুকের দেশ থেকে,
জল স্থল সদাই উজল বরফে আছে ঢেকে ;
বিশাল দেহ তিমির সনে সিন্ধুঘোটক খেলে,
সারা জীবন ঠক্ ঠক্ ঠক্ কাঁপ্‌বে সেথা গেলে।

বালকগণ। সারা জীবন ঠক্ ঠক্ ঠক্ কাঁপ্‌ব সেথা
লাফিয়ে উঠে চড়্‌ব মোরা হরিণ
চকমকে সে তুষার ঠেলে দি

(দ্বিতীয় পথিকের আগমন)

বালকগণ। কোথা থেকে আস্‌ছ তুমি ছোট্ট মানুষটী ?
গল্প যদি বল্‌তে পার বল ত একটী।

২য় পথিক। আস্‌ছি আমি সুদূর হ'তে, তীব্র রবির করে,
মনের সুখে কাফ্‌রী যথা ঘরকন্না করে,
কষ্টে অতি খনির সোণা তুল্‌ছে নরনারী,
মরুর পরে থপ্‌ থপ্‌ থপ্‌ যাচ্ছে উটের সারি।

বালকগণ। মরুর পরে থপ্‌ থপ্‌ থপ্‌ যাচ্ছে উটের সারি।
জলের তরে শুষ্ক পথিক ব্যস্ত অতিশয়,
দূরে থেকে টুং টুং টুং ঘণ্টা-ধ্বনি হয়।

(তৃতীয় পথিকের আগমন)

বালকগণ। কোথা থেকে আস্‌ছ তুমি ছোট্ট মানুষটী ?
গল্প যদি বল্‌তে পার, বল ত একটী।

৩য় পথিক। আস্‌ছি আমি রবি যথা, প্রথম দেখায় মুখ,
নধর নধর চা-গাছ দেখে সবার বাড়ে বুক ;
স্বভাবে দুরন্ত বাঘ জঙ্গলে বিচরে,
ডুম্‌ বন্দুকের রব হাতীর দাঁতের তরে।

বালকগণ। গুড়ুম্ গুড়ুম্ বন্দুকের রব হাতীর দাঁতের তরে।
অস্ত্র শস্ত্র লয়ে সেথা শিকারীরা যায়,
মিছামিছি বনের পশু মারে সমুদায়।

(চতুর্থ পথিকের আগমন)

বালকগণ। কোথা থেকে আস্‌ছ তুমি ছোট্ট মানুষটী ?
গল্প যদি বল্‌তে পার, বল ত একটী।

৪র্থ পথিক। আস্‌ছি আমি রবি যথা ডুবে সবার শেষে,
নদ নদী প্রকাণ্ড হ্রদ আছে যেই দেশে ;
বড় বড় ঘাসের বনে বুনো মহিষ ধায়,
অসভ্য লাল-ইণ্ডিয়ান আজো দেখা যায়।

বালকগণ। অসভ্য লাল-ইণ্ডিয়ান আজো দেখা যায়।
গায়েতে রং, মাথায় পালক লোমের জুতা পরে,
বড় বড় নদীতে যায় কাঠের ডিঙ্গী চড়ে।

৪র্থ পথিক। চালিয়ে ডিঙ্গী মনের সুখে, লাফিয়ে উঠে তীরে,
নাচে গায়, হাসে খেলে, সবাই ঘুরে ফিরে।

সকলে একত্রে। উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব্ব পশ্চিম, যা বলনা ভাই,
দেশের মত এমন স্থান আর এ জগতে নাই।

চাঁদের কথা।

পূর্ব্বদিকে সূর্য্য উঠে, পশ্চিমে অস্ত যায়। যতক্ষণ সূর্য্য দেখা যায়, ততক্ষণ দিন, যতক্ষণ দেখা যায় না, ততক্ষণ রাত্রি। এমনি, দিনের পর দিন, তিন শত পঁয়ষট্টি দিনে বৎসর হয়। চাঁদও পূর্ব্বে উঠে, পশ্চিমে ডুবে। তবে চাঁদ রাত্রে দেখা যায়; কখন বা দিনেও দেখা যায়। চাঁদ যে দিন সমস্তটা দেখা যায়, সে দিন পূর্ণিমা। পূর্ণিমার পর চাঁদ ক্রমে ছোট হয়, ক্রমে যেন ক্ষয় পায়; চৌদ্দ পনর দিন পরে আর কিছুই দেখা যায় না। তখন অমাবস্যা হয়। তার পর চাঁদ আবার বাড়িতে থাকে। আস্তে আস্তে বাড়িয়া আবার চৌদ্দ পনর দিন পরে পূর্ণিমার রাতে পূর্ণচন্দ্র দেখা যায়। চন্দ্র, সূর্য্য ছাড়া আকাশে আমরা কত তারা দেখি। তাহারাও পূর্ব্বে উঠে, পশ্চিমে অস্ত যায়। এইরূপে সূর্য্য, চন্দ্র ও তারাগণের উদয় অস্ত প্রত্যহ হইতেছে।

তোমরা হয়ত শুনিয়া থাকিবে, চাঁদও একটা ছোট খাট পৃথিবীর মত। পঞ্চাশটা চাঁদ একত্র করিলে পৃথিবীর মত আকারে হয়। কাজেই চাঁদ পৃথিবীর চেয়ে অনেক ছোট। আকারে পঞ্চাশগুণ ছোট; ওজনেও অনেক কম। আশীটা চাঁদের ওজন পৃথিবীর ওজনের সমান।

চাঁদে মানুষ আছে কি না? খুব সম্ভব মানুষ নাই। চাঁদে জল নাই, বায়ু নাই, আমাদের মত মানুষ থাকিবে কিরূপে? আচ্ছা, যদি চাঁদে জল বায়ু থাকিত, আর মানুষ থাকিত, তাহা হইলে তাহারা আকাশে চাহিলে কি দেখিত, জানিতে ইচ্ছা হয় না কি?

আমরা আকাশে তারা দেখি; চাঁদে মানুষ থাকিলে, তাহারাও তেমনি তারা দেখিত। তাহাদেরও আকাশে পূর্ব্বদিকে তারা উঠিয়া পশ্চিমে অস্ত যাইত।

মনে কর, তুমি চাঁদে গিয়াছ! কি দেখিবে? চাঁদে দিন রাত্রি ঘটিবে। সূর্য্যের উদয় অস্ত হইবে। তবে চাঁদের দিন কত লম্বা! চাঁদের এক একটা দিন, আমাদের সাড়ে উনত্রিশটা দিনের সমান। সূর্য্যের উদয়ের পর আমাদের দিনের চৌদ্দ পনর দিন ব্যাপিয়া সেখানে সূর্য্য দেখা যায়। তার পর অস্ত। তার পর চাঁদের রাত্রি। আবার সেই রাত্রি পোহাইতে আমাদের চৌদ্দ পনর দিন কাটিয়া যায়। বুঝিতে পারিতেছ, সেখানকার দিনই বা কেমন, আর রাতই বা কেমন! আমরা যদি কোন মতে চাঁদে যাইতে পারি, তবে সেখানে এক দিনের মধ্যে কতবার আহারের যোগাড় করিতে হইবে! আর, এক রাত্রি ঘুমাইয়া শেষ করাও কুম্ভকর্ণের মত লোকের পক্ষেই সম্ভব।

আমাদের এই যে দিন, ইহাই যখন একটু বড় হয়, তখন আমরা গ্রীষ্মে ছট্‌ফট্ করি; আবার রাত যখন একটু বড় হয়, তখন শীতে কাঁপিতে থাকি। চাঁদে দিনের বেলা কেমন গরম, আবার রাত্রে কেমন ঠাণ্ডা, মনে করিতে পার কি?
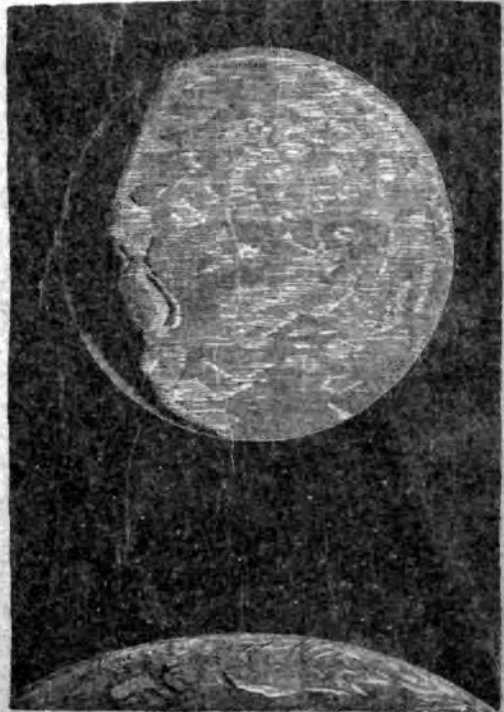
আমাদের সূর্য্য আছে; চাঁদেরও সূর্য্য আছে। আমাদের চাঁদ আছে; চাঁদেরও কি চাঁদ আছে? আছে বৈ কি! আমাদের এই পৃথিবীই চাঁদের চাঁদ। আমরা কখন দিনের বেলায়

কখন রাত্রে, চাঁদ দেখি ; চাঁদে যদি কেহ থাকিত, তবে সেও কখন দিনের বেলা, কখন রাত্রে এই পৃথিবীকে, অর্থাৎ চাঁদের চাঁদকে দেখিত। কিন্তু আমাদের চাঁদ ও চাঁদের চাঁদ কি ঠিক্ একই রকম ? কখনই নহে। আমাদের চাঁদ ছোট, লোকে বলে, পূর্ণচন্দ্র একখানা থালার মত, আর চাঁদের চাঁদ মস্ত, আমাদের চাঁদের বারটার সমান।

আমাদের চাঁদ কখন ছোট হয়, কখন বড় হয়। পূর্ণিমার দিন পূর্ণচন্দ্র ; অমাবস্যার চাঁদ দেখাই যায় না। চাঁদের চাঁদও ছোট হয়, বড় হয়। যখন খুব বড় হয়, যখন পূর্ণ-চন্দ্র হয়, তখন আমাদের বারটা চাঁদের মত হয়। আবার ক্রমে ছোট হইতে হইতে চৌদ্দ পনর দিন পরে কিছুই দেখা যায় না।

সব চেয়ে আশ্চর্য্য একটা কথা। আমাদের চাঁদের উদয় আছে, অস্ত আছে। কিন্তু চাঁদে যদি মানুষ থাকে, তবে তাদের চাঁদের উদয়ও নাই, অস্তও নাই। সে চাঁদ আকাশের ঠিক এক জায়গাতেই দাঁড়াইয়া থাকে। তাহারা দিবা রাত্রি চিরকাল ধরিয়া এক জায়গাতেই চাঁদকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিতেছে। তাদের চাঁদ আপন স্থান হইতে নড়ে না, কেবল একটু ইতস্ততঃ দোলে মাত্র। সেই এক জায়গাতেই দাঁড়াইয়া দুলিতে দুলিতে, আস্তে আস্তে ছোট হইয়া অদৃশ্য হয়, আবার আস্তে আস্তে বড় হইয়া, গোলাকার পূর্ণচন্দ্র হয়।

আর একটা কথা। আমাদের পৃথিবীর যে যেখানেই থাক্, সকলেই চাঁদ কখন না কখন দেখিতে পায়। চাঁদের এক পিঠে যদি দাঁড়াও, তাহা হইলে চাঁদের চাঁদ চিরকালই দেখিবে ; তাহার আর উদয় অস্ত ঘটিবে না। কিন্তু যদি অন্য পিঠে যাও, তাহা হইলে কোন কালে চাঁদ দেখিতে পাবে না। সেই পিঠে যদি কোন প্রাণী বাস করে, সে কখন চাঁদের চাঁদ, অর্থাৎ আমাদের পৃথিবী দেখিবে না।

আমাদের যেমন গ্রহণ হয়, চাঁদের লোকেরও তেমনি গ্রহণ হয়। আমাদের যখন চন্দ্র-গ্রহণ, ঠিক্ সেই সময়ে তাদের সূর্য্যগ্রহণ। আর আমাদের যখন সূর্য্যগ্রহণ, সেই সময়ে তাদের চন্দ্রগ্রহণ।

আকাশের তারাগুলি আমরা যেমন দেখি, চাঁদের লোকেও তেমনি দেখে। তবে আমরা দিনের মধ্যে নক্ষত্রগণের একবার উদয়, একবার অস্ত দেখি। তাহারা আমাদের দিনের ২৭ দিনে একবার উদয়, একবার অস্ত দেখে। একবার ভাবিয়া দেখ, আমাদের সঙ্গে চাঁদের লোকের কত তফাত্। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে চাঁদে মানুষ নাই। এই সকল আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিবার কেহ নাই। আর যদি থাকিত, তাহাদের পক্ষে সেই ঘটনাই স্বাভাবিক হইত। আমরা যা আশ্চর্য্য মনে করি, তাই তাহারা স্বাভাবিক মনে করিত।

পরাজয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

১০ বৎসর পরের কথা বলিতেছি। এই ১০ বৎসরের মধ্যে আমাদের গ্রামের অনেক গুলি পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহার মধ্যে এখানে কেবলমাত্র দুটী ঘটনা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। প্রথম—আমার মামার হঠাৎ মৃত্যুতে, সুযোগ পাইয়া, আমাদের এক দুর্দ্দান্ত জ্ঞাতি ফাঁকি দিয়া আমাদের সমুদায় বিষয় সম্পত্তি এমন কি, বসত বাটীটী পর্য্যন্ত আত্মসাৎ করেন। মা ও আমি একেবারে পথের ভিখারী হইয়া পড়ি। দ্বিতীয়—আমার চিরশত্রু নেপালচন্দ্র রায় কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে বি-এ, বি-এল, পাশ করিয়া ওকালতী ব্যবসা আরম্ভ করে।

নেপাল ওকালতী আরম্ভ করিয়া, সর্ব্বপ্রথমেই গ্রামস্থ বালকগণের জন্য নিজ বাড়ীতেই একটী পুস্তকালয় স্থাপন করিল। সপ্তাহে সপ্তাহে সেখানে নানা সদ্বিষয়ের আলোচনা হইতে লাগিল। আমার পূর্ব্ব সঙ্গিগণের অনেকেই নেপালের বশীভূত হইয়া,তাহার দলে গিয়া যোগ দিল। কেবল কতকগুলা গুঁচা ছেলে আমার দলেই রহিল। আমি বনগাঁয়ে শেয়াল রাজার ন্যায় তাহাদের উপর আধিপত্য করিতে লাগিলাম। আমার ন্যায় তাহাদের কাহারও ঘরে অন্নের সংস্থান ছিল না। কিন্তু আমার দেখাদেখি সকলেই তেল কুচ্‌কুচে চুলগুলিতে আলবার্ট কাটিতে এবং কোঁচান চাদর বুকে বাঁধিয়া চুরট টানিতে টানিতে নদীর ধারে বেড়াইতে শিখিয়াছিল। আমরা কয়েকজনে মিলিয় পূর্ব্ব হইতেই একটী কন্‌সার্টের দল গঠন করিয়াছিলাম। আমাদের বেহালা ও বাঁশীর কঁ্যা-কোঁ রবে এবং ঢোলকের দুম্-দাম্ শব্দে পাড়ার লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

নেপাল যখন পুস্তকালয় স্থাপন করিয়া, পাড়ার ছেলেদের লইয়া, নানাবিধ সদ্বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল, এবং একে একে আমার দলের ছেলেদের টানিতে লাগিল, তখন আমিও তাহার কার্য্যে বাধা দিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ইহাতে দুই দলের মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় শীঘ্রই আবার শত্রুতা বাঁধিয়া উঠিল।

এইরূপে কিছুদিন যায়, একদিন বৈকালে উচ্চতানে আমাদের কন্‌সার্ট চলিতেছে, এমন সময় আমাদের বাড়ীর নিকটে জেলে পাড়ায় একটা হৈ হৈ শব্দ উঠিল। আমি দলের একজনকে কারণ অনুসন্ধানে পাঠাইয়া দিলাম, সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "জেলে পাড়ায় আগুন লেগেছে। ঘর দোর জিনিষপত্র সব পুড়ে গেল।"

"আগুন নিভাবার কোন চেষ্টা হচ্ছে না?"

"হ্যাঁ, বহু লোক জড় হয়েছে। নেপালের দলও সেখানে গিয়ে পড়েছে। তারা সকলে প্রাণপণ চেষ্টায় পুকুর থেকে কল্‌সী কল্‌সী জল তুলে আগুনে ঢাল্‌ছে।"

নেপালের দল সেখানে গিয়াছে শুনিয়াই, আমার পরোপকার প্রবৃত্তি নিভিয়া গেল। আমি বলিলাম, "সেই সাধুরাই তবে আগুন নিভাক্, আমাদের আর যাওয়ার দরকার নাই। এস আমরা বাজাই।" পুনরায় আমাদের কন্‌সার্ট চলিতে লাগিল।

খানিক পরে শব্দ থামিয়া গেল। নেপালের দল আগুন নিভাইয়া চলিয়া আসিল এবং একেবারে আমাদের আড্ডায় প্রবেশ করিল। নেপাল সকলের অগ্রে দাঁড়াইয়া বিরক্তির স্বরে বলিল, "তোমরা মানুষ না কি? পাড়ায় আগুন লেগে ছারখার হয়ে গেল, আর তোমরা স্বচ্ছন্দে কন্‌সার্ট বাজাচ্ছ? তোমরা একেবারে অধঃপাতে গেলে? ছি!"

নেপালকে সকলেই মান্য করিয়া চলিত সুতরাং কেহ তাহার কথার জবাব দিতে সাহস করিল না; কিন্তু আমি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না, বলিলাম, মুখ সাম্‌লে কথা কও, ফের যা তা বল্‌বে তো টের পাবে। আমি কাউকে কেয়ার করি না।"

গোপীনাথ বলিল, "কিহে মোহনলাল, অত চটো কেন? আমাদের কি বোর্ডিংএর মাষ্টার পেয়েছে নাকি, যে অত ভয় দেখাচ্ছ?"

আমার আঁতে ঘা দিয়া গোপীনাথ কথা বলাতে রাগে আমি আত্মহারা হইলাম এবং "দেখ্ গুপে, আমার সঙ্গে চালাকী করিস্‌নে" বলিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে গেলাম। গোপীনাথও ঘুষী বাগাইয়া ছুটিয়া আসিল। আমি হাতের কাছে আর কিছু না পাইয়া, একটা লোহার হাতুড়ী উঠাইয়া তাহার দিকে খুব জোরে ছুড়িয়া দিলাম। সে নিমেষ মধ্যে একটু সরিয়া দাঁড়াইল, আর মনে করিতে এখনও গা কাঁপে, সেই হাতুড়ী ঠিক নেপালের কপালে গিয়া লাগিল। নেপাল চীৎকার করিয়া মাটীতে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। রক্তে তাহার নাক, মুখ, কাপড় চোপড় একেবারে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। মা উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে করিতে বাড়ীর ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিয়া, ক্ষত স্থানে কাপড় ভিজাইয়া জল দিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে অনেক লোক জড় হইল এবং নানাপ্রকার আশঙ্কা করিতে লাগিল। কেহ বলিল, "নেপাল বাঁচিবে না।" কেহ বলিল, "মোহনলালের ফাঁশী হবে।" আমি দেখিয়া শুনিয়া একেবারে স্তম্ভিত! কি সর্ব্বনাশ ফাঁসি হবে? আমার পা ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, বুকের ভিতর গুর্‌গুর্ করিতে লাগিল, মুখ শুকাইয়া উঠিতে লাগিল। গোপীনাথ বজ্রমুষ্টিতে আমার হাত ধরিয়াছিল, আমি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না, দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া বসিয়া পড়িলাম।

নেপালের সঙ্গীদের ইচ্ছা আমাকে পুলিশে দেয়, কেবল নেপালের অনুমতির জন্য তাহারা অপেক্ষা করিতে লাগিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে নেপাল চেতনা লাভ করিলে, তাহার দলস্থ কয়েকটী বালক পুলিশে যাইবার উপক্রম করিল। মা আবার চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। কিন্তু নেপাল কিছুতেই আমাকে পুলিশে দিতে সম্মত হইল না। বলিল, "রাগের বশে মোহনলাল একটা অন্যায় কাজ ক'রে বসেছে, তা ব'লে কি তাকে পুলিশে দিতে হবে? কখনই না। তোমরা উহাকে ছেড়ে দাও।"

বাল্যাবধি অন্যায় কার্য্য করিতে করিতে আমার স্বভাব এতদূর বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে, নেপালের এই মহৎ ক্ষমা গুণকেও আমি শ্রদ্ধা এবং ভক্তির চক্ষে দেখিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, আমাকে পুলিশে না দিবার মধ্যে নিশ্চয়ই নেপালের কোন মতলব্ আছে। তাহা না হইলে সে এত বাগে পাইয়াও কখনই আমাকে ছাড়িত না। এই ভাবিতে ভাবিতে, আমি অন্যত্র প্রস্থান করিলাম।

ইহার কিছুদিন পরে একটী নূতন বিপদ ঘটিল। তখন আষাঢ় মাস। আমাদের বাড়ী হইতে দুই ক্রোশ দূরে একটী পল্লীতে রথের বড়ই ধূম। তাহাতে দেশ বিদেশের বহু লোক সমাগম হইয়া থাকে। রথের পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময় তিনটী পথিক আমাদের বাড়ীতে অতিথি হইলেন। তাঁহারা খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া, সে রাত্রি আমাদের বাড়ীতেই রহিলেন। পরদিন সকালে আমি বাহিরে আসিলে, তাঁহারা বলিলেন, "মহাশয়, আমরা রথ দেখিতে যাইব, কিন্তু আমাদের সঙ্গে কিছু টাকা আছে, তাহা আপনার নিকট রাখিয়া যাইতে চাই। অপরিচিত স্থানে—বিশেষতঃ মেলার মধ্যে—এতগুলি টাকা লইয়া যাইতে আমাদের সাহস হয় না।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনাদের নিকট কত টাকা আছে?

পথিকগণ। আজ্ঞে জমীদারী খাজনা দিবার জন্য বহু কষ্টে আমরা ১২০০ টাকা সংগ্রহ করিয়াছি, সেই সমুদায় টাকাই আপনার নিকট রাখিয়া যাইতে চাই।

এতগুলি টাকা গচ্ছিত রাখিতে আমার ভয় হইল। বলিলাম, "আমাকে ক্ষমা করিবেন, এত টাকা আমি রাখিতে পারিব না। যদি কোন বিপদ আপদ ঘটে, আমি মারা যাব।"

পথিকগণ। দেখুন, অন্য কোন উপায় থাকিলে, আমরা আপনাকে কষ্ট দিতাম না। আপনার অনুগ্রহে কাল আমরা আশ্রয় পাইয়াছি, এখন কিছুক্ষণের জন্য টাকাগুলি রাখিয়া আমাদিগকে নিশ্চিন্ত করুন।

"তবে নিতান্তই যদি আপনারা নিরুপায় হইয়া থাকেন, টাকাগুলি রাখিয়া যান, কিন্তু অগ্রে একখানি কাগজে লেখা পড়া করিতে হইবে।"

"লেখা পড়ার আর কি দরকার? আপনার নিকট টাকা থাকিবে, ইহাতে আমাদের ভয়ের কোনই কারণ নাই।"

"না, তা হবে না, লেখা পড়া চাই। বিনা রসিদে আমি এত টাকা কখনই রাখিব না।"

"আচ্ছা, নিতান্তই যদি লেখা পড়া করিতে হয়, তবে ভাল করিয়াই হউক। আমাদের নিকট ষ্ট্যাম্প কাগজ আছে।"

এই বলিয়া তাঁহারা একখানি ষ্ট্যাম্প কাগজ বাহির করিলেন। সেই কাগজে এইরূপ লেখা পড়া হইল যে, "পথিকেরা তিন জনে আসিয়া সমুদায় টাকা লইবেন। তিন জনে একত্রে টাকা লইতে না আসিলে, মোহনলাল বাবু গচ্ছিত টাকা যেন না দেন।"
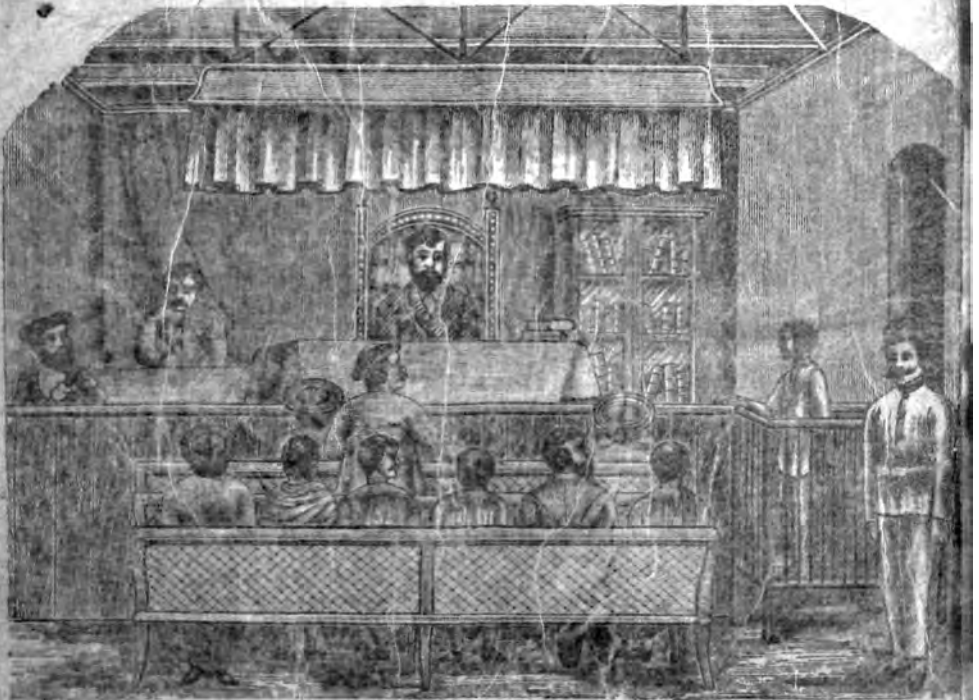
রীতিমত লেখা পড়া প্রস্তুত হইলে, পথিকেরা মেলা দর্শনে বাহির হইলেন। আমিও থলিয়াটী লইয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। তার পর আমি টাকাগুলি একটী লোহার সিন্ধুকে তুলিয়া রাখিবার বন্দোবস্ত করিতেছি, এমন সময় বয়ঃজ্যেষ্ঠ পথিকটী ফিরিয়া আসিয়া, আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'মহাশয়, তাড়াতাড়িতে একটা ভুল হইয়া গিয়াছে। টাকার

মধ্যে তিন খানি নম্বরী নোট আছে, সেই নম্বরগুলি আমরা টুকিয়া রাখিতে চাই। আপনি অনুগ্রহ করিয়া টাকাগুলি লইয়া, একবার বাহিরে আসুন।"

পথিকের কথায় অসন্দিগ্ধভাবে থলিয়াটী তাঁহার হাতে দিয়া বলিলাম, "আপনি নম্বর টুকুন্ গে, আমি একটু পরেই বাহিরে যাইতেছি।"

পথিক যে সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিল, আপনা হইতেই তাহা উপস্থিত হইল। আমি বাহিরে আসিবার পূর্ব্বেই পথিক টাকার থলিয়া লইয়া চম্পট দিল। আমি বাহিরে আসিয়া কাহাকেও না দেখিয়া, ভয়ে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলাম এবং আসন্ন বিপদের কথা ভাবিয়া শিরে করাঘাত করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার সময় অপর দুই জন পথিক উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদের গচ্ছিত টাকা প্রার্থনা করিলেন।

আমি নিতান্ত বিষণ্ণভাবে বাহিরে আসিয়া বলিলাম, "সে টাকা আপনাদের তৃতীয় সঙ্গী লইয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে আপনারা সে টাকা পাইবেন।"

পথিকগণ। সে কি মহাশয়, তাঁহাকে আপনি টাকা দিলেন কার হুকুমে? সকালে কিরূপ লেখাপড়া হইয়াছে, তাহা কি আপনার মনে নাই? এখন ও সব বাজে কথা রাখুন, আমাদের টাকা ফিরাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত করুন।

"টাকা আমার কাছে নাই।"

"আচ্ছা, সহজে না দেন, আমরা আদায় করিয়া লইব," এই বলিতে বলিতে পথিক দুই জন কোথায় চলিয়া গেলেন।

এই ঘটনার তিন চারি দিন পরে, আদালতের এক জন পেয়াদা আসিয়া আমাকে শমন দিয়া গেল।

তারপর যথাসময়ে মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। আমার নামে অতি গুরুতর অভিযোগ। যথাবিহিত মোকদ্দমার বন্দোবস্ত করিতে আমি চেষ্টা করিলাম, কিন্তু আর্থিক দুরবস্থা নিবন্ধন কোন অভিজ্ঞ উকিলের সাহায্য পাইলাম না। কেবল একজন বৃদ্ধ মোক্তার দয়া-পরবশ হইয়া, আমার পক্ষ অবলম্বন করিলেন; এবং সাধ্যমত যত্নে মোকদ্দমা চালাইতে লাগিলেন। ফরিয়াদী দুই জনের পক্ষে দুই জন অভিজ্ঞ উকিল নিযুক্ত হইলেন।

প্রথম চারিদিন ধরিয়া ফরিয়াদী পক্ষের উকিলগণ নানা যুক্তি তর্কের সাহায্যে মোকদ্দমাটী বেশ সুন্দর করিয়া দাঁড় করাইলেন। তাঁহাদের পঞ্চম দিনের সুদীর্ঘ বক্তৃতা শুনিয়া, মোকদ্দমার ফলাফল বুঝিতে আর কাহারও বাকি রহিল না। সকলেই বুঝিলেন, আমাকে কঠিন শাস্তি পাইতে হইবে।

যতই দিন যাইতে লাগিল, আমি ততই যেন অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলাম। হায়, কি পরিতাপের বিষয়! শৃঙ্খলাবদ্ধ পায়ে কয়েদখানার প্রহরীর কি ভয়ানক অত্যাচারই না সহ্য করিতে হইবে! দারুণ রৌদ্রে পাথর ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে একটু থামিলেই প্রহরীর বেত্রাঘাতে সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়া দর দর ধারে রক্ত পড়িতে থাকিবে। এইরূপ মর্ম্মান্তিক কষ্টে মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কাটিবে, তবুও আমার লাঞ্ছনার বিরাম নাই, শেষ নাই। হয়তঃ বা কয়েদখানার নরকপুরীতেই আমার জীবন-নাট্যের পরিসমাপ্তি হইবে! ভয়ে ও দুঃখে আমার মনে এইরূপ নানা চিন্তার উদয় হইতে লাগিল।

মোকদ্দমার ষষ্ঠদিন উপস্থিত হইল। মোক্তার মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সাধ্যমত যত্নে গুছাইয়া গুছাইয়া দুই চারিটী কথা বলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ফরিয়াদী পক্ষের উকিলের তাড়ায় তাঁহার অর্দ্ধেক কথা মুখেই রহিয়া গেল। যে টুকু বলিলেন, তাহাতে মোকদ্দমার গতি ফিরিবার একটুও সম্ভাবনা রহিল না। মোক্তারের বক্তৃতা শেষ হয় হয়, এমন সময় এক আকস্মিক ঘটনা ঘটিল। আদালতের চাপরাশী একখানি কার্ড আনিয়া বিচারকের হাতে দিয়া, তাহার উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। বিচারক কার্ডখানি পড়িয়া কি লিখিয়া দিলেন, চাপরাশী বাহিরে চলিয়া গেল। একটু পরই উকিলের সাজ্‌গোজ্ পরা আমার চিরশত্রু নেপাল আসিয়া, সম্মুখের আসনে উপবেশন করিল।

আদালতের মধ্যে নেপালকে দেখিয়া আমার আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। এ কি! নেপালের এখানে আসিবার কি প্রয়োজন? এখানেও সে শত্রুতা করিতে আসিল? ছিঃ ছিঃ নেপাল এত নীচ! আমি এইরূপ নানা কথা ভাবিতেছি, এমন সময় নেপাল উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিচারককে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "হুজুর, আপনার অনুমতি পাইলে, আমি আসামীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া এখানে কিছু বলিতে চাই।"

বিচারক সম্মতি প্রদান করিলেন। আমি স্থিরনেত্রে অবাক্ হইয়া নেপালের দিকে চাহিয়া রহিলাম। নেপাল বলিতে লাগিল, "আমি যতদূর বুঝিয়াছি, এই মোকদ্দমায় আসামীর পক্ষে বলিবার বিশেষ কিছুই নাই। আসামীর কাছে টাকা যে গচ্ছিত ছিল, তাহার রসিদ রহিয়াছে। এখন সেই টাকা ফিরাইয়া দিলেই সব গোলযোগ মিটিয়া যায়। কিন্তু টাকা দেওয়া যায় কাহাকে? ষ্ট্যাম্প কাগজে লেখা রহিয়াছে, 'তিনজনে একত্রে টাকা লইতে না আসিলে, মোহনলাল বাবু গচ্ছিত টাকা যেন না দেন।' কিন্তু এখানে কেবলমাত্র দুইজনে টাকার দাবী করিতেছেন। আইনানুসারে টাকার দাবী করিবার ইহাদের কোনই অধিকার নাই।"

এইটুকু বলিয়াই নেপাল বসিয়া পড়িল। বিচারক মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে কাগজ পত্র উল্টাইতে লাগিলেন। সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল ভাবিয়া, ফরিয়াদী পক্ষের উকিল দণ্ডায়মান হইয়া নেপালের সকল কথাই যে অর্থহীন, তাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বিচারক তাঁহার কথায় কাণ দিলেন না। মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইয়া গেল।

সহস্র ভার নিমেষ মধ্যে যেন আমার বক্ষ হইতে নামিয়া গেল! আমি জাগ্রত কি নিদ্রিত কিছুই যেন ঠিক করিতে পারিলাম না। বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় সেই আদালতের মধ্যেই ছুটিয়া গিয়া, নেপালের পায়ে জড়াইয়া পড়িলাম। আমার বাক্যরোধ হইয়া আসিল; সহস্র চেষ্টাতেও তাহাকে আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়া জানাইতে পারিলাম না। এত দিনের এত চেষ্টায় যাহা হয় নাই, আজ এই ঘটনায় তাহা সম্পন্ন হইল। দেবত্বের কাছে পশুত্ব পরাজিত হইল। আমি পরিষ্কাররূপেই বুঝিতে পারিলাম, এ জগতে সাধুতার জয় এবং অসাধুতার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী!!

ধাঁধার উত্তর।

৪

৫

৬। পাঠকপাঠিকাগণ নিজেরা একটু চেষ্টা করিলেই পথটা বাহির করিতে পারিবেন। পাছে মজাটুকু নষ্ট হয়, সেইজন্য তাহা দেখাইয়া দিলাম না।

৭। প্রতিবাসী কোন ব্যক্তির নিকট হইতে একটী ঘোড়া আনিয়া ১৮টী ঘোড়া একত্র কর। সেই ১৮টী হইতে বড় ছেলেকে অর্দ্ধেক, অর্থাৎ ৯টী ঘোড়া দাও, মেজ ছেলেকে তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ ৬টী ঘোড়া দাও এবং ছোট ছেলেকে নবমাংশ, অর্থাৎ ২টী ঘোড়া দাও। এইরূপে ঘোড়াগুলি বিতরণ করিয়া, অবশিষ্ট ঘোড়াটী প্রতিবাসীকে ফিরাইয়া দাও।

৮। $\frac{৩৫}{৭০}+\frac{১৪৮}{২৯৬}=\frac{১}{২}+\frac{১}{২}=১$।

৯। যে বৃত্ত হইতে প্রথম গণনা আরম্ভ করিবে, সেই বৃত্তটী যাহাতে ঠিক ৪র্থ স্থানে পড়ে, দ্বিতীয়বারে এমন আর একটী বৃত্ত হইতে গণনা আরম্ভ কর। আবার এই শেষোক্ত বৃত্তটী যাহাতে ৪র্থ স্থানে পড়ে, তৃতীয় বারে এমন আর একটী বৃত্ত হইতে গণনা আরম্ভ কর। এইরূপ করিতে করিতে দেখিবে, একটি বাদে আর সকল গুলিতেই দাগ পড়িয়াছে।

১০।

১১। সেই চিড়িয়াখানায় ২৪টা পশু ও ২টা পাখী ছিল।

আশীর্ব্বাদ।

হ'ক ভাই, তোমাদের প্রফুল্ল জীবন,
শত শত আশার কিরণ!
নিরাশার অন্ধকারে, লয়ে যেন যেতে পারে,
নবশক্তি, নবোৎসাহ, উদ্যম নূতন,
তোমাদের প্রফুল্ল জীবন।

হ'ক ভাই, তোমাদের মধুর জীবন,
স্নেহভরা আনন্দ-ভবন!
দীন অসহায় যারা, স্থান যেন পায় তারা,
মুছাইতে পারে যেন সজল নয়ন,
তোমাদের মধুর জীবন।

হ'ক ভাই. তোমাদের সুন্দর জীবন,
স্বরগের নন্দন কানন!
ন্যায়, সত্য, পবিত্রতা বিকশিত হ'ক তথা,
সুধার সৌরভে মত্ত করুক ভুবন,
তোমাদের সুন্দর জীবন।